শারদীয়া লিপিকা

SHARODIYA LIPIKA

আশ্বিন ১৪২৫ • OCTOBER 2018
দ্বাদশ বর্ষ ১ম সংখ্যা • VOLUME 12 ISSUE 1

EDITOR
Dr. Jharna Chatterjee

COORDINATOR
Aditya Chakravarti

WEBMASTER
Subhankar Pandit

COVER DESIGN
Reeto Ghosh
Oishee Ghosh

Beautiful British Columbia (1)

Tanima Majumdar

Editorial ******* সম্পাদকীয়

Dear Lipika readers,

"Fall is here", the white clouds sailing on a clear, blue sky announce joyfully. Temperature is dipping down, sunshine pours clear, golden honey, and soon, the colours of the leaves will be enchanting. We are proud to present once more our Lipika, filled with a variety of attractive offerings for your enjoyment. English and Bengali poems, scholarly articles, short stories, light compositions, travelogues, paintings and photos, from both adults and children, provide you with a real smorgasbord. We are especially proud to have our younger participants' contributions. Oishee and Reeto have designed a most appropriate cover for Lipika this year, like the last few years. I hope we will continue to publish Lipika for many years to come, and to enrich our cultural experience in Ottawa.

True to our tradition, we are ready to worship Ma Durga with other Deshantari members, and celebrate the glory of this unique emblem of United Spiritual Strength. At the same time, we keep in our mind that Ma Durga, to Bengali people, represents a married daughter who leaves her mountain abode behind every year, and visits her parents, accompanied by her children and all their animal carriers, only for three days. She is a beloved, close family member, not merely an all-powerful deity.

My best wishes to all of you on Durga Puja. May Ma Durga remove all darkness from our lives and guide us towards the path of auspicious, eternal light.

Jharna Chatterjee, Editor, Lipika

Note 1: Opinions published in Lipika, a community magazine, belong to the writers. The Lipika team is not responsible for those in any way.

Note 2: "We try to do our best within a short period of time, with many other limitations - any errors or inadequacies are unintentional."

প্রিয় লিপিকার পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ,

সোনালী, মিষ্টি রোদ্দুর গায়ে মেখে শরতকাল এসেছে দুয়ারে। পাতাদের রূপ বদল, রঙ বদলের কাল আসন্ন।

আবার আমরা গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, রম্যরচনা, ছবি, আলোকচিত্র দিয়ে সাজিয়ে শারদীয়া লিপিকার ডালি তুলে ধরছি সবার হাতে - ছোটবড় সবার দানে সমৃদ্ধ। ছোটদের লেখা, আঁকা আমাদের কাছে বিশেষ গর্বের ও আদরের বস্তু। ঐশী আর ঋত এবারেও পরম সুন্দর প্রচ্ছদ এঁকে আমাদের মুগ্ধ করেছে। আশা করি বছরের পর বছর এই ভাবেই লিপিকা সবাইকে আনন্দ দেবে এবং অটোয়ার বাঙালিদের সংস্কৃতি-জগতকে আকর্ষনীয় করে তুলতে পারবে।

দেশান্তরীর প্রথা অনুযায়ী আবার আমরা সদস্যেরা মিলে মিশে দুর্গাপূজার আনন্দোৎসবের আয়োজনে মেতে উঠেছি। বাঙালির মনে মা দুর্গা একাধারে সর্ব দেবতার সম্মিলিত তেজোপুঞ্জ, আ বার বৎসরান্তে প্রত্যাগতা প্রবাসিনী, আদরিণী কন্যা। সন্তানদের ও সঙ্গে তাদের বাহনদের নিয়ে তিনি পিত্রালয়ে আসেন মাত্র তিনটি দিনের জন্য। প্রবাসী মনে সুর তুলেছে আগমনী গান, কল্পনায় দেখছি সুবাসিত শিউলি ফুলে আর বেলপাতায় ভরা সাজি, আকাশে-ভেসে থাকা শাদা মেঘের ডানায় চলে যাচ্ছি সুদূরে, অনেক পিছনে ফেলা আসা দিনগুলিতে।

আমার আন্তরিক শুভ কামনা জানাই সবাইকে। মা দুর্গা সব দুর্গতি দূর করুন, তাঁর দৃষ্টিপাতের মংগল-আলোয় সকলের জীবন আলোকিত হয়ে উঠুক।

ঝর্ণা চট্টোপাধ্যায়, সম্পাদিকা, লিপিকা

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ১ লিপিকা সর্বজনীন পত্রিকা। এর লেখায় প্রকাশিতে মতামত সম্পূর্ণ ভাবে লেখক-লেখিকাদের। লিপিকার কর্মীবৃন্দ এ র জন্য দায়ী নন।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ ২ অনুগ্রহ করে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি মার্জ্জনা করবেন

****** সূচীপত্র Contents ******

SHARODIYA

লিপিকা

আশ্বিন ১৪২৫ দ্বাদশ বর্ষ ১ম সংখ্যা

October 2018 Volume 12 Issue 1

1.	Beautiful British Columbia (1)	Tanima Majumdar	1
2.	Editorial/সম্পাদকীয়	Jharna Chatterjee/ঝর্ণা চট্টোপাধ্যায়	2
3.	সূচীপত্র/Contents	Lipika 2018 Team	3
4.	বাঙালীর পুজো	সুপর্ণা মজুমদার	4
5.	A Villa in Ranigunje	Subhalakshmi Basu Ray	5
6.	Female Divinity in Hinduism	Sourendra K. Banerjee	7
7.	Bhimbetka – A Prehistoric Wonder	Subhash C. Biswas	9
8.	ম্যান্ডেলার দেশে কয়েকদিন	গৌর শীল	12
9.	পুতুল খেলা	নন্দিতা ভাটনগর	18
10.	তবে কেন মিছে ভালবাসা	ঝর্ণা চট্টোপাধ্যায়	21
11.	বাস্তু-সাপ	মদনমোহন ঘোষ	24
12.	এলেম নতুন দেশে	মৈত্রেয়ী সাহা	26
13.	পিপীলিকা	বেণু নন্দী	28
14.	গতি আর বেগতি গল্পের সংকলন	আদিত্য চক্রবর্ত্তী	29
15.	নাগকেশরের ফুল আর একটি টিয়া	সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস	31
16.	রোদচশমা	অমর কুমার	33
17.	Beautiful British Columbia (2)	Tanima Majumdar	38
18.	দুটি ফুল - জল রঙে	Shila Biswas	39
19.	South African Animals, Kruger	Jharna Chatterjee	40
20.	Krishnokoli of Rabindranath	Arun Roy	41
21.	Triveni of our backyard in Ottawa (Canada) & Varanasi (India)	Nirmal K. Sinha	42
22.	(বি)স্মৃতি তুমি.....।।	বাসবী চক্রবর্তী	47
23.	Khajuraho	Subhash C. Biswas	48
24.	Aakash (Sky)	Moumita Dutta (Grade 9)	61
25.	Global Warming	Srobona Ghosh (Grade 12)	63
26.	সব দেশে মোর ঘর আছে	Arun Roy	65
27.	Road Trip to beautiful destinations	Sayesha & Sanjana Roy Choudhury (Grades 7 & 4)	*68*
28.	*The Garden*	*Swarnava Ghosh (Grade 9)*	*70*
29.	The Transformation: Narendra to Swami Vivekananda	Moitree Dutta (Grade 6)	72
30.	আমার পূজা/My worship	Jharna Chatterjee	74
31.	The Charity Stream	Reeto Ghosh (Grade 9)	75
32.	হেসে নাও দুদিন বই তো নয়...	(নানা উৎস থেকে সংগৃহীত)	76
33.	Iceland spleandour	Jharna Chatterjee	78
34.	The Bird	Arna Nandi (Grade 2)	79

বাঙালীর পুজো

সুপর্ণা মজুমদার

বাঙালী - তার পেশা যাই হোক না কেন, নেশা যাই হোক না কেন, তার বুকের তলায় লুকিয়ে রয়েছে তার সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা, তার ভাবুক মন - তার কাব্যের জগৎ।

সাধারণতঃ, দুর্গা পূজার সময় হল চৈত্র মাস - বাসন্তী পূজাই আদি দুর্গা পূজা - দেবী দুর্গার আরাধনা। কিন্তু বাঙালীর সৌন্দর্য্যপ্রিয় মন বেছে নিল - শ্রীরামচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণে অকালবোধনের সময়টি - যখন প্রকৃতি সেজেছে অপরূপ সাজে - নীল আকাশে হাল্কা মেজাজে ভেসে যায় সাদা মেঘ - ঢেউ ওঠে সাদা বকের পাখায়, পাগল হাওয়া লুকোচুরি খেলে বেড়ায় সাদা কাশফুলের আঁচলে।

প্রকৃতির এই অপরূপ আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে প্রতিটি বাঙালীর মনে। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে সেও মেতে ওঠে দেবী দুর্গার আরাধনায়। তাই কবি গেয়ে ওঠেন - "আনন্দময়ীর আগমনে আনন্দে গিয়েছে দেশ ছেয়ে"।

দেবী দুর্গা আনন্দস্বরূপিনী - তাই আনন্দই আমাদের পূজার মূলকথা। বৈদিক সভ্যতার নিরাকারের অর্চনা, দ্রাবিড় সভ্যতার সাকার ঈশ্বর, ও পুতুল পূজার যুগ পেরিয়ে, শঙ্করাচার্য্য আনলেন নিরাকার ও সাকারের সমন্বয়। তারপর আরও দুশো বছর পরে এলো রামানুজের modified non-dualism - পরিবর্তিত অদ্বৈতবাদ। তারও একশ বছর পর মাধবাচার্য্য প্রচার করলেন দ্বৈতবাদ। কিন্তু তিনি এবং পৃথিবীর অন্যান্য যে সমস্ত ধর্মগুরু ধর্ম প্রচার করেছেন তাঁরা সবাই বলেছেন ঈশ্বর superior, মানুষ inferior। নয় নিজের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখো - "সোঅহম্", আর নয়তো তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করো ভৃত্য রূপে। ভালো কাজ করলে, ধর্ম পথে চললে পাবে পুরষ্কার (স্বর্গের আশ্বাস) অধর্মের পথে চললে পাবে তিরস্কার (নরক বাস)।

১৪০০ শতাব্দীতে সাধক বাঙালী শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু সবপ্রথমে ভগবানকে পেতে চাইলেন ভালবাসার জন হিসাবে - ভক্তির মাধ্যমে। শ্রীকৃষ্ণ ভগবান তাঁর এমন একজন বন্ধু, যার এক মুহূর্তের বিরহও তাঁর অসহ। ভক্ত এখানে ভক্তির মধ্য দিয়ে তাঁর ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতে চাইছেন। ১৭০০ শতাব্দীতে শাক্ত সাধক রাম প্রসাদ সেন - মা কালীকে খুব কাছের মানুষ কল্পনা করেছিলেন এবং তাঁর লেখা শ্যামা -সঙ্গীত গুলি বাঙালীর পরম প্রিয়।

১৮০০ সাল নাগাদ আরেক বাঙালী সাধক ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ঘটালেন সর্বধর্ম সমন্বয়। বললেন "যত মত তত পথ"। কর্ম যোগ, জ্ঞান যোগ, ভক্তি যোগ - যে পথেই যাওনা কেন, ঈশ্বর উপলব্ধি হবে। ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর ছিল মা ছেলের সম্পর্ক। মান অভিমান, ঝগড়া, ভালোবাসা।

চৈতন্য দেবের পরে ও শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের আগে কোন সময় বাঙালী প্রচলন করলো শারদ উৎসবের মাধ্যমে দেবী আরাধনা। ভক্তি আর ভালোবাসার পথে সে যেন এগিয়ে গেলো আর এক পা। দুর্গা আমাদের মা, আবার সেই মা আমাদের মেয়েও বটে। এখানে সেই বিশ্ব পিতা, বিশ্ব মাতা, সৃষ্টি কর্তা - inferior, superior এর concept কোথায় গেলো হারিয়ে। ভালোবাসা ও আবেগের আতিশয্যে বাঙালী কল্পনা করে বসলো মা দুর্গা যেন তার আদরের ছোট্ট মেয়ে

- সারাবছরে একবার সে মোটে চারটি দিনের জন্যে বাপের বাড়ী আসে । একটিবার ভেবে দেখুন, ঈশ্বরকে এমন রূপে আর কোন জাতি বা ধর্ম দেখেছে ?

আমরা পূজা মন্ডপের একপাশে সংস্কৃত মন্ত্রের মাধ্যমে বৈদিক আচারে পূজো করি, আরেক পাশে চলতে থাকে stage বেঁধে নানা অনুষ্ঠান - গান বাজনা নৃত্য গীত । যাঁরা বাঙালী নন তাঁরা ভেবে পাননা আমরা ধর্মানুষ্ঠান করছি না আনন্দ উৎসব করছি । ধর্মানুষ্ঠানকে ঘিরেই বাঙালী আনন্দ উৎসব করে - তার এখানেই বৈশিষ্ট্য ।

A Villa in Ranigunje

Subhalakshmi Basu Ray

I grew up straddling two worlds, within the walled seclusion of my childhood home, Desswood Villa. Built around the turn of the 20th century, for British officers of Burn and Co, and their memsahibs, it was a sprawling bungalow with cool, darkened rooms, high ceilings and exquisitely wrought, ceramic floor tiles. A deep verandah ran right around the house, keeping out the heat and dust of the plains of Bengal. An ornate fireplace with a black, Italian marble mantlepiece, dominated the drawing room, as it used to be known in those days. Never used, it nonetheless, stood as a reminder of the world beyond. Way beyond the walls of the villa. Way, way beyond the seas, that washed the shores, of the land of my birth.

My mother was a keen gardener. Cornflowers, larkspurs and petunias grew in riotous profusion in her winter garden. Along the front wall, beside the imposing front gate, were two cherry trees, planted by some homesick memsahib. Not only did they survive the harsh Indian summers and incessant monsoon rain, but for one brief, enchanted period of time in Dec/ Jan, they shed their leaves and were covered with frothy blossoms!

My family was the first Indian occupants of Desswood Villa. This was post- Independence and my indomitable, high spirited mother was determined to give the house an Indian makeover! Rajasthani miniature paintings hung on the walls of the drawing room. Ivory figurines of Hindu gods and goddesses adorned the mantlepiece. (Those were the days, when elephants were poached recklessly for their tusks.) The memsahib's dressing room, adjoining the master suite, was turned into a "Pujar Ghar". Ma planted jasmine, gardenia, oleander and frangipani in the garden, along with night jasmine (sheuli) and land lotus (sthal padma) by the gate. A leafy Rangoon Creeper (malati lata) grew by the stone steps of the verandah. Come summer, it was festooned with variegated blooms of pink and white. There were flowers in the garden all through the year. I was always able to take an offering of fresh flowers for the nuns in school, on their feast days.

All the bungalows in the compound had names: "The Nest", "Gables", "Bellevue", "The Rectory" (must have belonged to the local Anglican church before it was acquired by the company), and of course, "Desswood Villa". The grandest of them was "Lal Kothi", designated for the General Manager. With tennis courts, a large garden and stables which were converted to garages, it was set well off the main road.

Most of the bungalows had resident ghosts! A wispy, shadowy woman in white, wandered through the guava grove in the Rectory. Belle Vue, allegedly, had a ghostly Great Dane keeping watch, on moonless nights. The avenue of wood apples (Bel) that led to “Lal Kothi” from its gate, sheltered multiple other worldly beings! Bel trees are apparently much favoured in the spirit world! Desswood Villa had a resident ghost as well: a holy man in flowing robes and shod with wooden clogs. How and why he took up residence in Desswood Villa, remains a mystery! But there he was, seen by a few and heard by many, a benign presence, not really in any one’s way!

Both my parents were avid readers. Though it was Ma who did most of the parenting and all the disciplining, it was our father, gentle, reclusive, scholarly Baba, who made sure our intellectual needs were met. Our library included ten volumes of Arthur Mee’s Children Encyclopaedia, an anthology of Upendra Kishore Ray Choudhuri, monthly subscription to “Sandesh”, abridged versions of English classics and a beautifully illustrated “The Tales from Shakespeare” by Charles and Mary Lamb, which perhaps sparked my abiding interest in English Literature. Growing up in an industrial town, I hardly felt restricted, with enough books to free my mind and fire my imagination!

The passage of the seasons was dramatic in Desswood Villa. Summers meant Gul Mohar trees ablaze with coral bursts of flowers, early morning school and long afternoons exploring the shady depths of the fruit trees at the back of the house.

The monsoons were the least favoured of the seasons for me, bringing with it months of limp school uniforms and squelching keds on gym days. Nonetheless, I looked forward to the Jhhulan Yatra festival held in the month of Shravan, at the Searsole Rajbari. A far less illustrious branch of the Bardhaman Raj family, they lived in a fairly large estate on the outskirts of Ranigunje, with a fenced in English park, a pretentious main gate emblazoned with the family crest and a rajbari built on three sides of a modest formal garden. For the festival, the family idols of Radha and Krishna, resplendent in brocades and jewels, were placed in a flower bedecked swing, in a leafy bower lit by myriad oil lamps. The royal ladies mingled with the guests, dressed in gauzy kotas and gossamer fine organzas, demurely veiled, with diamonds gleaming on royal noses and earlobes! The gentlemen were portly and perfectly unremarkable in western attire!

After months of sullen skies and sodden fields, we would wake up one morning to warm sunshine, a freshness in the air, a shower of sheuli by the gate and the sthal padma heavy with buds. About two weeks before the start of the Durga Puja holidays, we would return home from school one afternoon, to find Ali the tailor, on a mat in the front verandah, whirring away on Ma’s Usha sewing machine! He would arrive on the passenger train from Asansol every morning, bespectacled and bent with age, stitching everything from school uniforms to party clothes.

We had ten days off from school for the Pujas and we usually drove to Kolkata, to spend them with extended family. On the times that we did not, we went to the Durgotsav at the Ram Krishna Mission in Asansol, dressed always in new clothes but shod in old hawai chappals. (“You don’t want to lose your new shoes, do you?!”, I was reminded.) I loved the aratis at the mission but was ill at ease with the crowds. I much preferred Lakshmi Puja, which was celebrated in the peace and sanctity of our pujar ghar.

In preparation, Ma would have the servants scrub the white tiled pantry from top to bottom and scour the brass pots and pans to a burnished sheen. She prepared the “Bhog” herself: dalda fried “loochies”, “begun bhhaja’, “chholar daal”, “mohan bhog” and “payesh”. My brother and I were charged with making Lakshmi’s footprints with rice paste, which kept us busy for better part of the day, as there were multiple doors to deal with! Ma did the alpana in the sanctum sanctorum.

Sometimes our grandparents visited us from Kolkata, accompanied by an ancient grand aunt, our “Pishi Thakuma”. Tall, fair, with shorn hair and always dressed in pristine white, she created the most exquisite alpanas. Starting with concentric circles, drawn using a piece of chalk and some string, she meticulously filled the spaces with leaves and flowers, shells and paisleys and other traditional motifs, while my brother and I watched with wide eyed wonder!

I did not turn to look back, as we drove out of the gate for the last time. I was almost fifteen and impatient to embrace the world that lay beyond the walls of my childhood home. I did not know it then, but Desswood Villa has had a hold on me, even after all these years. Even today, it appears to me in my dreams. Someday, I have promised myself, I will go back, if it is still standing. Is it……

Female Divinity in Hinduism

Sourendra K. Banerjee

The concept of female Divinity developed over centuries in inter-textual Scriptures. The epithet Mahadevi (1st a as in tall, 2nd as in father) or simply Devi as the Supreme Being is synonymous with the term 'Mother'. As pure consciousness She is primordial matrix or the great womb in which potentiality thrives at the dawn of creation. This idea of an abstract medium in which creation gestates incorporates the concepts of Prakriti, Shakti and Maya (both a as in father) which have been thriving in India over a long time. Prakriti as the material principle in cosmogony is found in Samkhya Karika as well as in ancient Jain and Buddhist texts. Prakriti may be conceived as a multidimensional field (neither existence, nor non- existence) where subtlest (really transcendent) 'guna' or units of created beings (Sentient or not) constantly move. However Prakriti is subservient to Purusha(s). Yogasutra talks about the 'chief purusha' which later becomes Isvar or Saguna Brahma(n). Purusa or Isvar is the efficient cause of creation. In some texts Isvar provides the seeds to Prakriti which becomes 'Visva garva' (Womb that gestates the Cosmos).

Prakriti as a creative principle is comparable to Shakti. Rigved (3.5) uses the word 'Bal' many times: "the great divine might of all gods is unique". Later Scriptures extend this 'might' as Kundalini (coiled) Shakti in all human beings. The femininity of this Shakti becomes explicit in Vedic goddesses and in Tantrik and Puranic literature. All Hindu Schools accept Shakti as a Cosmogonic principle. Radhakrisnan says that the Ultimate Principle Brahman (both a as in tall) carries pluralities and contraries within Itself and the Universe is the manifestation (Bibhuti) of its Shakti (power, energy, potency). Certain Puranas (like Markandeya) go so far as to suggest that Shakti is Brahman. Thus Supranormal Brahma-Shakti is simultaneously the provider of seeds of creation as well as the womb for gestating.

Some schools in Hinduism would suggest that the phenomenal universe is Maya (both a as in father) or a mere appearance. The cosmos is a stage where Mahamaya (the Devi) shows a shadow playing performance. She is the 'Aghatan Ghatan Patiyasi', the One Whose 'Lila' (play) creates 'make believe' in 'happenings' out of 'non-happenings'. They think Brahman is the exclusive reality. They interpret Maya as meaning non-being (Ma is 'not' and Ayam is 'this/this entity). Many others would interpret 'Ma' to mean to measure, therefore the universe of beings in a contingent reality, depending entirely on Brahma Shakti.

However all Theistic Schools will agree that reliance entirely on mundane reality or materialism is an intrinsic ignorance (Avidya). The Mother Mahamaya causes this but Her Grace will bestow Bodhi (insight) or ultimate realization of the Truth. Both Svetasvatar Upanisad (4.10) and Gita (7.14) state so. Devishakti is the foundation of all experiences and incorporates the essence of Prakriti and Maya. These are considered conceptually and grammatically female.

In Vedas multiple goddesses appear as cosmogonic principles. Apa (water) is the primordial unmanifest foundation. She is revered as Amrita or elixir of immortality. Ambrosia (as water in rosta/food) is the essence of food. Water and

food make a being. Water as 'ocean of consciousness' is like the Mother's womb. Here all gods gather at the dawn of creation. (R.V10.17.10: Apa asmamataaha etc, R.V.10.82.5: kang svigarvang Yatra Deva etc.). Purusa Sukta says that Divine breathing (spanda) in water initiated the creative process. We may note Apa is feminine but salil is neutral and Samudra is male. R.V. 10.63.2 describes another goddess Aditi (the unbounded) as well as earth. Aditi is the mother as well as the father of beings. Viraj is another female goddess. R.V 10.90.5 says Viraj and the Purus (the archetypal Man) create each other (Tasmadvirara jayata virajo Adhi Purusah etc.) We note that in these goddesses, gender identities are loosened. Androgynous and hermaphrodite concepts (as in Biblical Adam the first man who creates Eve) are undercurrent. Vedas also describe Viraj as a rhythmic metre (Sound vibration, Spanda). She resembles Vac Devi (Sarasvati) or 'Shabda Brahman'

In 'Mahabharatas' we find water along with other 'mahabhutas' of samkhya as the material cause of evolution (Parinam). Gita describes 'Bhagaban' as the ultimate Divine Being equated to Brahman and Prakriti as His second nature. Different Puranas elaborate on the functions of Shakti. She is attributed different names. Vaishnava literatures call Her Lakshmi. Bhagavat Puran describes Narayan (Brahman) asleep in the ocean of consciousness upon Sesa or Ananta (coiled serpent). He preserves His Brahma Shakti in the potentiality of Time (Kal; a as in father). This Shakti emerges out of His navel as Brahma (last a as in father) as a Lotus (Padma – rhythmic vibration). Eventually three worlds came to be. The Purans weave many ancient tales of gramdevis (local goddesses) within the Vedic and Tantrik frames.

Tantrik Scriptures stress more on the female roles of the Divinity. Markandeya Puran is one such important Puran. Devi Mahatmya (also called Sapta Sati and better known as Chandi) is a part of this Puran. This text raises the Devi to the highest reality – Brahman. Devi is indescribable but for human comprehension. She is called variously as Maha Maya, Mula Prakriti, Maha Shakti, etc. She is eternal but incarnates with different names for different purposes. She pervades the whole Cosmos. She dwells in every being. As Brahman the Mother is both Nirguna (an appropriate transliteration is 'inactive') as well as the active potency. She is the source and finality of all that were, that are or ever will be. As 'Shabda Brahman' She is also the principle of activation. She is the Supreme and only Reality.

It may be noted before conclusion that the title of this article is somewhat of a misnomer. Even graspable entities like light or sound cannot be given a gender identity or be quantified. The concept of Divinity is transcendent, intangible and abstract. Mundane categorization by number or gender only delimits the Divinity. Various Scriptural male or female names are for introducing the abstract concepts. The Vedic statement "Truth is one, scholars use multiplicity of names" should guide us in our study.

Om Tat Sat

Bhimbetka – A Prehistoric Wonder

Subhash C. Biswas

The sounds of time travelling

In its endless course,

Can you hear them?

Its Chariot rolls for ever and ever

Raising heartbeats deep in the galaxies;

Cries of the stars pierce

The heart of darkness,

Darkness crushed by its wheels.

From *The Last Poem* by Rabindranath Tagore (translated).

Time travels eternally; but history can hardly boast of recording only an insignificant part of it. The early history of mankind remains mostly blurred for lack of valid evidence. Prehistoric man lived and flourished in various places of the world, India being one of them. In central India there is one such place called Bhimbetka in the foothills of the Vindhya Range in the province of Madhya Pradesh. Set in a natural environment, Bhimbetka is a rare, one of the most ancient prehistoric sites; it is a microcosm still in its pristine state, which encapsulates evolution of mankind from the Prehistoric to the Historical Period. Nature here is holding very dearly an invaluable evidence of continuing evolution of human life and culture, undisturbed and naturally protected. The archaeological finds of Bhimbetka that span from the Old Stone Age (Paleolithic Period) through the Middle Stone Age (Mesolithic Period) to the Early Bronze Age (Chalcolithic Period) are so amazing and revealing that history needs to be rewritten with the new facts. Nested in a forest (now called Ratapani Wild Life Sanctuary), Bhimbetka, except for changes due to forces of nature and for archaeological excavations, has remained amazingly unaltered and continues to retain its geomorphological character and eco-system. Year after year for thousands of years this microcosm has been a repository of rock shelters that preserve continuing traditions of human creativity manifested in rock paintings and other artifacts.

Bhimbetka was first referred to as Bhimbet by W. Kincaid, a British Official, in one of his papers in 1888 as a Buddhist site on the shore of Bhojpur Lake. The hilly area here was known as Bhimbet hills where Raja Bhoj, King of Bhojpur, used to visit the Buddhist caves. Since then it remained in obscurity for many years until 1958 when V. S. Wakankar, an archaeologist from Vikram University, Ujjain, discovered the rich heritage of prehistoric rock paintings in this site. His discovery too, however sensational it might have been, remained neglected until 1971 when the first archaeological excavation was initiated by K. D. Bajpai and S. K. Pandey of H. S. Gaur University, Sagar. In the following year Wakankar and later Y. Mathpal carried out further extensive archaeological survey of the region and uncovered over 750 cave shelters and developed a basic reference system for classifying them. A huge treasure of Stone Age cultural remains from about 30000 years ago was brought to light. Extensive archaeological studies and excavations of this region by numerous archaeologists and other scholars ensued from this finding.

Cave Painting - Bhimbetka

Today Bhimbetka has become an UNESCO World Heritage site for this archaeological treasure that has monumental importance in the history of human race. People from all over the world come to see its cave dwellings and rock paintings. Bhimbetka is situated about 45 km from the capital city Bhopal and is linked with it by Bhopal – Hoshangabad National Highway No. 69. Bhopal is connected with the major cities of India like Delhi, Mumbai, Indore and Kolkata by air and other means of transportation. Best time to visit this region is from October to March. We visited Bhimbetka in the month of January, 2017. We rented a car at Bhopal and drove to Bhimbetka. On the way we stopped at Bhojpur where we took the opportunity to visit the famous Bhojeshwar Temple that is dedicated to Lord Shiva. This eleventh century incomplete temple has a magnificent, richly carved dome and houses an enormous Lingam. This Lingam is about 6 m in circumference and is carved out of a single stone. Built on a massive three-tiered sandstone platform, this is the largest monolithic Lingam in India. No one should miss this opportunity to visit Bhojeshwar Temple while travelling to Bhimbetka from Bhopal.

Arriving at Bhimbetka visitors will be astounded by the captivating beauty of its densely forested hills and its cool, pleasant surroundings. The caves and shelters are spread here over an area of ten square kilometers. This area extends over seven hills – Bhimbetka and six more. On Bhimbetka alone, archaeologists have been able to identify and number 243 shelters grouped in six clusters A to F. One nearby hill, Lakha Juar, contains 153 shelters grouped in three clusters A to C and another, Bhonrawali, has 181 shelters in seven clusters A to G.

The art works on the rock-walls were executed in various colours and styles. Archaeologists have identified at least twelve colour shades and as many styles. Among the colour shades, red and white are seen to have been used most often; green and yellow were used too though less frequently. These colours were made from locally available minerals such as soft red stone, manganese, hematite, and charcoal, plant extracts and animal fat. Bare, uneven rock surface in its natural state served as canvas for painting. Many of the painted surfaces were used several times by artists of later periods. It is a wonder how these colours survived through the harsh beatings of weather for thousands of years. The archaeological evidences suggest that there has been a continuous human settlement in these shelters from the Old Stone Age (Paleolithic Period) to the Early Bronze Age (Chalcolithic Period), which continued until as recently as the second century BCE. The scenes of the rock paintings depict many kinds of animals, hunting, dancing, war, burials, religious rites and house-hold activities. Among animals there are horses, boars, barasinghas (swamp deer), sambars, stags, goats, nilgais, deer, antelopes and many more. As many as 561 drawings of horses have been found in Bhimbetka, of which 510 are shown with their riders. Apart from these, there are human figures, mother and child, men carrying dead animals etc. Some religious symbols, deities like Ganesha and Shiva, tree gods, chariots are also seen.

The tourist has to walk a considerably long distance of about one and a half kilometer on up and down slopes in the forest where majestically stand many tall, massive hills. Cave shelters of varying shapes and sizes can be seen on these hills. It may be tiring to walk up and down the hills, but it is amazingly rewarding and entirely satisfying and definitely worth the time and effort. Interest and intense curiosity will drive the tourist from cave to cave and make him wander in the remote past with fascinating imagination. Some of

the caves have intriguing shapes resembling animals like turtle, dinosaur, lion etc. One of them appears like a gigantic cobra with its hood soaring high up in the sky.

Of all the caves one stands out as the most spectacular. It has been called Auditorium Cave by V. S. Wakankar. Thirty-nine meters long, four meters wide and seventeen meters high, this cave is identified as No. III F-24. It has four openings, two each on the east and west ends, and four branches that are aligned to the four cardinal directions. One of many remarkable features of this cave is the existence of cupules on the huge boulder on the western end. These cupules, according to some scholars, are regarded as the earliest manifestation of man's creative tendency. Numerous paintings of various shades are noticed in this cave. They include both human and animal figures. Among animals there are deer, oxen, leopards, buffalos, antelopes, elephants, tigers, peacocks, etc.

Cave Paintings - Bhimbetka

Another cave that needs mentioning is the one numbered as III C-50. It is 14 m long and 6.2 m wide and the height of its opening is 3.4 m. As it contains a large number of animal paintings, it has been justly dubbed as Zoo Rock by V. S. Wakankar. There are 453 figures in this shelter, of which as many as 252 are animals and only 90 humans. Most of the figures are drawn in profile and in different shades of white. There are horsemen holding long spears, swords and shields. They are accompanied by two drummers and a staff man. The foot soldiers are also noticeable; they have long hair and typical head dress and are armed with swords, shields and arrows.

Bhimbetka is a unique experience, invaluable and unforgettable. It is a golden opportunity to witness the cultural landscape of human evolution through the rich profusion of paintings of its rock shelters that are still prevailing in pristine nature, undisturbed and unaltered. It is also remarkable that many elements of today's cultural traditions of the tribal peoples such as Gonds, Pradhans and Korkus inhabiting the villages surrounding Bhimbetka resemble those of the rock paintings.

For further reading:

1. Wakankar, V.S. Bhimbetka – The Prehistoric Paradise, *Prachya Pratibha*, Vol. 3, pp 7 – 29, 1975.
2. Mathpal, Y. *Prehistoric Rock Paintings of Bhimbetka, Central India*, Abhinav Publications, 1984.
3. Misra, V.N. Bhimbetka, *An Encyclopaedia of Indian Archaeology*, Vol. 2, pp 69 – 73, 1989.
4. Alam, Md. Shafiqul *Paleolithic Industries of Bhimbetka, Central India: A Morphometric Study*, Bangla Academy, Dhaka, 2001.
5. Wakankar, V.S. *Painted Rock Shelters of India*, Bhopal, Archaeology, Archives & Museums, Government of Madhya Pradesh, 2005.

----- XX -----

ম্যান্ডেলার দেশে কয়েকদিন

গৌর শীল

দক্ষিন আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলার দেশে যাবার সুযোগ এসেছিল বছর দুয়েক আগে। ঘুরেও এসেছি দিন সাতেক বিশেষ কয়েকটা জায়গায় । তার বর্ণনা নোটবই থেকে উদ্ধার করতে গিয়ে খেয়াল হোল যে গত ১৮ই জুলাই ছিল ম্যান্ডেলার শতবছরের জন্মদিন । প্রবাদপ্রতিম দেশনেতা ও মহান বিশ্ববন্ধু তিনি, তাঁকে স্মরণ করতে কলম ধরার এই বিশেষ সুযোগ কাজে লাগানো যেতে পারে ।

তাহলে পিছিয়ে যাওয়া যাক অদূর অতীতে । জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি, দক্ষিন আফ্রিকায় ভরা গরম । বেলা প্রায় ১টা, সূর্য্য মাথার ওপরই বলা যায় । আকাশ নির্মেঘ -- হাওয়ার দাপটও নেই তেমন -তাই রোদের তেজে বৈশাখের চোখ ঝলসানো দাপট । জ্যোৎস্না ও আমি দাঁড়িয়ে আছি একটা হাইওয়ের ধারে, দক্ষিণ আফ্রিকার রাজধানী Johannesburg থেকে প্রায় ১২০ কি: মি: পশ্চিমে । গিয়েছিলাম Sun City-র কাছে এক অভয়ারণ্য ঘুরে দেখতে আজই সকালে । সেখান থেকে ফেরার পথে চাকা ফেঁসে আমাদের গাড়ী অকেজো। এখন চাকা বদল না করলে আমাদেরও অবস্থা তাই - আমরাও অচল ।

মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে মুম্বাই থেকে শুরু হয়েছিলো দক্ষিন আফ্রিকার এই ঝটিকা সফর। প্রথমে ঠিক হয় দুই প্রধান শহর জো-বার্গ আর কেপ-টাউনের সঙ্গে Kruger Park পরিক্রমা করা হবে । পরে কিছু অদল বদল করে ভ্রমণসূচীতে জায়গা দেওয়া হয় কাছাকাছির মধ্যেই বিশ্বপ্রকৃতির দুই বিখ্যাত আকর্ষণ–Zimbabwe/Zambia সীমানায় ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত আর Botswana-র Chobe National Park-এ বন্যপ্রাণীর মহাসম্ভার - অগত্যা Kruger যাওয়া বাদ পড়ে ।

মুম্বাই থেকে Ethiopean Airways-এর পাঁচ ঘণ্টার উড়ান রাজধানী শহর Addis Ababa-তে এসে শেষ হয় । সেখানে আট ঘণ্টার লম্বা বিরতি । এই সময়ের কিছুটা খরচ করে শহরে ঘুরে আসা সম্ভব, কিন্তু আমাদের কোনো আগাম পরিকল্পনা ছিলো না তার । খোঁজ করে জানা গেল যে পাসপোর্ট জমা রেখে ও $35 fee দিলে Transit Visa পাওয়া যাবে - তারপর বাইরে গিয়ে যানবাহনের ব্যবস্থা করা ও শহর পরিক্রমা করা যায় । মাত্র কয়েক ঘণ্টায় এত সব ঝামেলার মধ্যে গিয়ে বিশেষ সুবিধে হবে বলে মনে হোলো না, তাই আমরা এয়ারপোর্টের লাউঞ্জে বিশ্রাম করে পরের Flight-এর জন্য তৈরী হলাম । Addis Ababa থেকে Johannesburg সাত ঘণ্টার উড়ান, প্রায় সারারাত লাগবে ।

জোহানেসবার্গের O. R. Tambo International Airport-এ পৌঁছান গেল স্থানীয় সময় ভোর চারটে নাগাদ । মালপত্র বলতে বেশী কিছু ছিলো না - দুটো Carry-on আর দুটো Handbag -- সব নিয়ে আমরা প্রথমে Immigration-এ গেলাম Visa নিতে । সেখান থেকে কাছেই ছিলো Hertz Car Rental-এর Counter । একটা মোটরগাড়ী আমাদের নামে আগে থেকে ঠিক করা ছিলো - কাগজপত্র সই করে পাওয়া গেল সেই Voxwagon Opel গাড়ীটা । গাড়ীর চাবি নিয়ে বেরিয়ে আসার সময় Hertz-এর কর্মচারী ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে জোহানেসবার্গ ও তার কাছাকাছি রাস্তায় গাড়ী চালাতে কোনও বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন আছে কি না । তিনি বললেন পুলিশ ছাড়া আর কারো অনুরোধে গাড়ি না থামাতে - মন্দ লোকেরা এখানে প্রায়ই গাড়ি ছিনতাই করে থাকে - সেই ব্যাপারে সাবধান!

দক্ষিণ আফ্রিকায় মোটর চলে রাস্তার বাঁ দিক ধরে (কানাডার উল্টো দিক), সেই মতো গাড়ীর Steering Wheel ডান দিকে বসানো । এর আগে অস্ট্রেলিয়াতে এই রকম বাঁহাতি গাড়ী চালানোর অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে তাই মনে মনে 'দুগ্গা, দুগ্গা' বলে রাস্তায় গাড়ী নামালাম । যাব ২০০ কিঃ মিঃ দূরে Pilanesburg Game Reserve ।

Pilasnesburg একটা মৃত আগ্নেয়গিরির বিশাল হাঁ-করা মুখ । বহুদিন ধরে সেই গহ্বর ভরে গেছে জল-জঙ্গল-নালা-পুকুরে । জন্তু জানোয়ারও অনেক থাকে এখানে । এই জঙ্গলে তৈরী করা হয়েছে একটা অভয়ারণ্য – অন্যান্য জায়গা থেকে হাতী, গন্ডার, চিতা, সিংহ ইত্যাদি এনে এখানে তাদের পুনর্বাসন দেওয়া হয়েছে । Kruger Park-এর মতো এখানেও বিশেষ গাড়িতে চেপে বন্যপ্রাণী দর্শনের আনন্দলাভের সুযোগ রয়েছে । আবার কিছুদূরেই বিখ্যাত Sun City – যেখানে তৈরী হয়েছে Las Vegas-এর মতো আমোদপ্রমোদের উপকরণ সাজিয়ে এক জমজমাট Casino Center ।

এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে হাইওয়ে ধরতে কোন অসুবিধে হয় নি, Direction মোটের ওপর সহজে বোঝা যায় । কিন্তু চার Lane-এর হাইওয়ে ঘণ্টাখানেক পরে Two Lane হয়ে গেল । তারপর হাইওয়ে ছেড়ে Regional Road-এ ৭৫ কিঃ মিঃ । এই রাস্তা গ্রামগঞ্জের পাশ দিয়ে গেছে মাঝে মাঝে, সেখানে রাস্তায় লোক হাঁটছে । আমাদের মোটরের আয়না একজন পথচারীকে বোধহয় সামান্য ধাক্কা দিয়ে চলে যায় । আমি ব্যাপারটা বুঝি কয়েক সেকেন্ড পরে কিন্তু পেছন ফিরে তাকাবার অবকাশ হয়নি – য: পলায়তি সঃ জীবতি!

প্রায় সাড়ে আট-টা নাগাদ Planesburg Reserve-এর Complex-এ গাড়ি থামলো । এখানকার পরিকাঠামোর মধ্যে অফিস, পার্কিং-লট, রেস্তোরাঁ, ওয়াশরুম সবই ছিলো । সকাল থেকে কিছু খাওয়ার ফুরসত মেলেনি – তাই Breakfast Buffet-তে বসে গেলাম । জলযোগ ও চা-পান সেরে আমরা তৈরী হলাম জঙ্গল সফরের জন্যে । মিনিট দশেকের মধ্যে একটা Special 4-Wheeler Van এসে গেল. সেখানে আমাদের কুড়ি-বাইশ জনের দলটা উঠে বসলো তড়িঘড়ি ।

Planesburg Game Reserve, বিখ্যাত Kruger Park-এর একটা Miniature version । আকারে-আয়তনে দক্ষিন আফ্রিকায় এর স্থান চার নম্বরে । তবে এখানেও Big 5 অর্থাৎ Lion. Buffalo, Leopard, Rhino ও Elephant-এর সাক্ষাত মিলতে পারে ভাগ্য সহায় হলে । সহজেই দেখা মিলে গেল হাতি, গণ্ডার, হিপো আর বনমহিষের । তাছাড়াও এধারে ওধাড়ে জটলা করেছিলো জিরাফ, এ্যান্টিলোপ ও ওয়াইল্ডবীষ্টের দল । কিন্তু পশুরাজ সামনে এলেন না এ যাত্রায় । আড়াই ঘণ্টার বনপরিক্রমা শেষ করে আমরা ফিরে এলাম ।

এবার আমরা ফিরবো জোহানেসবার্গের দিকেই । পথেই পড়বে Cradle of Humankind নামের সেই World Heritage Site যেখানকার চুনাপাথরের বিভিন্ন গুহার মধ্যে খুঁজে পাওয়া গেছে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের বিবর্তনের নানা উপকরণ । সেই ভেবেই আমরা এগোলাম N4 হাইওয়ে ধরে । কিন্তু যাকে বলে "বিধি বাম" আর তার ফলে মসৃণ ঝকঝকে রাস্তার মধ্যে আমাদের ঝাঁ-চক্চকে গাড়ীর একটা টায়ার গেল ফেঁসে । প্রথমে ঠিক বোঝাও যায়নি । ভাগ্যক্রমে গাড়ী খুব একটা টাল খায়নি, শুধু একটা ঘ্যাঁস্ ঘ্যাঁস্ আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিলো । আমরা রাস্তার পাশে গিয়ে সাবধানে গাড়ী থামালাম । তখন দেখা গেল সামনের বাঁদিকের টায়ারটা ফেঁসে গেছে । স্পষ্ট কোন কারণ ছাড়াই ।

টায়ার বদলানোর পদ্ধতি রপ্ত থাকলে এই সমস্যার মোকাবেলা করা যায় সহজেই, গাড়ীতে দরকারী যন্ত্রপাতি ও একটা অতিরিক্ত টায়ার মজুত আছে । কিন্তু আমার পক্ষে তার থেকে কম কঠিন উপায় CAA-এর শরণাপন্ন হওয়া । মুস্কিল হচ্ছে এই যে দক্ষিণ আফ্রিকায় CAA-র মতন Emergency Road Service কোথায় পাওয়া যাবে তাও আমার অজানা । তার জন্যে আমাদের Highway Patrol Police-এর অপেক্ষা করতে হবে ।

এর আগে একবার এইরকম পরিস্থিতিতে পড়েছিলাম জর্ডনে । কিন্তু ভাগ্য সেবার খুব ভাল ছিলো । টায়ার ফেটে যাবার পরে কি করা যায় ভাবছি এমন সময় উল্টোদিক থেকে একটা গাড়ী এসে থামে । চারজন তরুণ যুবক ছিল সেই

গাড়ীতে। বিনা বাক্যব্যয়ে তারা গাড়ীর ট্রাঙ্ক খুলে পাঁচ মিনিটের মধ্যে চাকা বদলে "বাই বাই" বলে চলে যায়। আমরা তো প্রায় হতবাক্! কিন্তু এবার কি তার পুনরাবৃত্তি সম্ভব? ধন্য আশা কুহকিনী!

যাই হোক, আমরা গাড়ীর সামনের Hood খুলে হাত নাড়তে থাকলাম সাহায্যের আশায়। একটু পরে একটা গাড়ী এসে থামলো। দুজন কৃষ্ণকায় লোক ছিল গাড়ীতে। আমরা তাদের অনুরোধ করলাম Highway Police-কে ফোন করে ডেকে দিতে পারে কিনা। আমাদের গাড়ীর চাকা বদলাতে হবে শুনে তারা লেগে গেল কাজে। গাড়ীর ট্রাঙ্ক খুলে Jack আর Spare টায়ার বার করলো। আমরা ভাবলাম ভাগ্য এবারও ভাল তাহলে ! কিন্তু তা হবার নয়। Jack লাগিয়ে গাড়ীর সামনের দিক উঁচু করে টায়ারটা খুলতে গিয়ে দেখা গেল অসুবিধে হচ্ছে। কোনও কারনে নাটবল্টুগুলো পিছলে যাচ্ছে, তাদের আলগা করা যাচ্ছে না। কিছুক্ষণ চেষ্টা করে তারা হাল ছেড়ে দিলো, চলে গেল একটা Tow Truck পাঠাবার আশ্বাস দিয়ে। আমরাও যে তিমিরে ছিলাম সেই তিমিরেই রয়ে গেলাম।

এর পরে থামলো যে গাড়ীটা সেটায় যাচ্ছিল একটি কৃষ্ণাঙ্গ ফ্যামিলী -- স্বামী, স্ত্রী ও ছোট্ট বাচ্ছা। এরা চালাচ্ছিল আমাদের মতো একই মডেলের আর একটা গাড়ী। লোকটি নেমে আসতে আমরা জানালাম আমাদের Problem-টা। সে তখন Nut-গুলো খোলার চেষ্টা করতে করতে আবিষ্কার করলো যে প্রতিটি Nut-এর মাথায় একটা Plastic-র ঢাকনা লাগানো আছে, যেটা না খুললে Nut-টা ঘোরানো যায় না। এরপর সেই ঢাকনাগুলো খুলে নিয়ে তারপর Nut-গুলো খুলে চাকা পাল্টানো হোলো। আবার গাড়ী উঠলো হাইওয়েতে। তবে যে চাকাটা লাগানো হয়েছিলো সেটা একটা Emergency Spare,অর্থাৎ Full-size নয়।

আমরা সোজা এয়ারপোর্টে গিয়ে Hertz-কে গাড়ীটা ফেরৎ দিয়ে দিলাম। আর গাড়ী চালিয়ে কাজ নেই। আফশোষ এই যে কয়েক ঘণ্টা সময় নষ্ট করার ফলে Cradle of Humankind যাওয়ার Planটা বাতিল হয়ে গেল। ট্যাক্সী ধরে Airport থেকে এবার হোটেলে চলে এলাম। ম্যান্ডেলার দেশে প্রথম দিন এভাবেই সাঙ্গ হোল।

দ্বিতীয় দিন শুরু হোল সকাল সকাল। যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে আমরা বেরোলাম জোহানেসবার্গের বিশেষ বিশেষ কয়েক জায়গায় হাজিরা দিতে। এখন আর সঙ্গে মোটর নেই, তাই অন্যান্য যানবাহন ব্যবহার করতে হবে। বিদেশে শহরের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে সাধারণতঃ ট্যাক্সী ব্যবহার করাই সুবিধা, কিন্তু যানজটের কবলে পড়লে খরচ যায় বেড়ে। ট্যাক্সী পেতেও অসুবিধা কম হয় না কখনও কখনও -প্রতারণার সম্ভবনা তো আছেই।

আমাদের গন্তব্য শহরের মাঝামাঝি অঞ্চলে। হোটেলে খোঁজ করে জানা গেল Airport থেকে শহরে যাওয়ার জন্য Gautrain নামে যে Express Train যায় সেটি নিঃসন্দেহে দ্রুত ও নিরাপদ। উপরন্তু, হোটেল থেকে Train Station পর্যন্ত Shuttle Bus-এর ব্যবস্থাও আছে। অতএব আমরা শাট্ল বাস ও ট্রেন ধরে চলে এলাম শহরের মধ্যে Rosebank Station-এ। এখানে টিকিট কাটতে হবে Hop-on Hop-off টুরিষ্ট বাসের। লাল রঙের এই Sightseeing বাসগুলো সবকটা উল্লেখযোগ্য Attraction-এ ঘুরে ঘুরে আসে। সারাদিন ধরে এই বাস ব্যবহার করে ইচ্ছেমত জায়গায় যাওয়া যায়। ৩০ মিনিট অন্তর এদের ধরতে পারা যায় যে কোনও Bus Stop থেকে। আমরা টিকিট কেটে উঠলাম সেই বাসে। শহরের মধ্যে প্রধান সড়ক ধরে, মাঝে মাঝে নির্দিষ্ট জায়গায় থেমে থেমে এবং যাত্রী উঠিয়ে-নামিয়ে এগোতে থাকলো বাসটি। দোতলা এই বাসের প্রতিটি Seat-এর পাশেই ছোট ছোট Earphone রয়েছে যাতে ইচ্ছেমতন কানে লাগিয়ে লাগাতার ধারাবিবরণী শোনা যাবে।

বাসরুটের ১৪ নম্বর স্টপে নেমে সামান্য হেঁটে আমরা Apertheid Musium-এর সামনের দরজায় পৌঁছলাম। প্রবেশপথটি দুভাগে ভাগ করা -- একদিকে লেখা WHITES এবং অন্য দিকে NON-WHITES - যদিও এই বিভাজন

একটা Symbol মাত্র, ভেতরে ঢোকার জন্য নিজের ইচ্ছেমত যে কোনও একটা দিক বেছে নিতে এখানে আজ কোন নিষেধ নেই ।

ভেতরে ঢুকে প্রথমেই চোখে পড়বে এক জায়গায় সারি দিয়ে দাঁড়ানো বেশ উঁচু কয়েকটা Concrete Pillars, তারা প্রত্যেকে তুলে ধরেছে একটি করে শব্দ – Freedom, Equality, Diversity, Respect, Responsibility, Reconciliation । ছবি, পোষ্টার, Film, Artifact দিয়ে সাজানো এই Multimedia Musium-টি মোটের ওপর খুবই মনোগ্রাহী ও আকর্ষণীয় । ঘণ্টা দেড়েক সময় এখানে কেটে গেল বেশ তাড়াতাড়িই এবং পরের Program-এর নির্দিষ্ট সময় এগিয়ে আসায় আমরা বাইরে চলে এলাম ।

Johannesburg-এর দক্ষিণ-পশ্চিম অংশে বর্ণবিভাজন নীতিকে কায়েম করে একটা Ghetto তৈরী হয় Colonial শাসনের সময়, যেখানে মূলতঃ কৃষ্ণকায় লোকেদের বাস । জায়গাটা কুখ্যাত হয়েছিলো SoWeTo নামে । এখানকার ঘরবাড়ী ছিল নিম্নমানের এবং অপরাধ ঘটত ঘনঘন । দিনের বেলাতেও এই অঞ্চলে যাতায়াত নিরাপদ ছিল না । বর্তমানে গত কয়েক দশক ধরে এখানকার সামগ্রিক উন্নয়নের চেষ্টা চলছে । তারই অন্যতম প্রয়াস টুরিষ্টদের এই SoWeTo ঘুরিয়ে দেখানো ।

একটা স্পেশাল Minibus চেপে SoWeTo পরিক্রমা শুরু হোল । বর্ণবৈষ্যমের লড়াইতে অনেক রক্ত ঝরেছে এখানে । তার একটার স্মৃতিসৌধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে Victor Peterson Memorial । অনতিদূরেই Mandela House, নেলসন ম্যান্ডেলার এই প্রাক্তন আবাসেও এখন একটি Museum করা হয়েছে । আর এক বিশ্ববন্দিত মনিষী নোবেলজয়ী ডেসমন্ড টুটু, তাঁর বাড়ীটিও ছিলো কাছাকাছি । Minibus থেকে নেমে ঐ সব জায়গায় ঘুরে আসা গেল আমাদের দলের সঙ্গে । এরপর ফিরে যাওয়া । এই এলাকায় আধুনিক ডিজাইনে যে সব নতুন বাড়ী তৈরী হচ্ছে তার কিছু নমুনা চোখে পড়লো এবার । SoWeTo থেকে বেরিয়ে আসার মুখে একটা Stadium আর একটা Waterworks-এ থেমে এই দুই Landmarks-এর ছবিও ক্যামেরাবন্দী করলাম ।

মিনিবাসের দু-ঘণ্টার SoWoTo পরিক্রমার পর আমরা আবার দোতলা বাসে উঠলাম । আধঘণ্টা পরে বাস থামলো Jo'Burg Carlton Center Tower ষ্টপেজে । এই টাওয়ারটি জো-বার্গের উচ্চতম অট্টালিকা । এর ৫০ তলার Observatory থেকে সমস্ত শহরটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিলো দিনের আলোয় । এই Floor-এই একটা Showcase-এ মহাত্মা গান্ধীজির তরুণ বয়সের কিছু ছবির সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর সংগ্রামের ইতিহাস পড়লাম । তারপর ওপর থেকে Ghandhi Square জায়গাটাও দেখলাম যেখানে তাঁর একটা ব্রোঞ্জ মূর্তি বসানো আছে ।

টাওয়ার থেকে নেমে এসে আবার বাস ধরে Rosebank Train Station-এ নামলাম আমরা। এটা বাসেরও Terminus। এবার আমাদের ট্রেন ধরে হোটেলে ফিরতে হবে । তার আগে আমরা কাছেই একটা Burger King-এ গিয়ে রাতের খাওয়া শেষ করে নিলাম । তারপর ট্রেনে চড়ে সকালে যেখান থেকে উঠেছিলাম সেই স্টেশনে ফিরলাম আমরা ।এখন কিন্তু হোটেলের Shuttle বাস না থাকায় একটা ট্যাক্সী ধরতে হোলো । সেই দিনই আমাদের একটা নতুন হোটেলে Shift করতে হবে । অতএব প্রথমে পুরানো হোটেলে গিয়ে আমাদের স্যুটকেস, ব্যাগ তুলে নিয়ে নতুন হোটেলে উঠলাম । এদিনের মতো ঘোরাঘুরি এখানেই শেষ কেননা আমাদের কোনও Night Program নেই ।

পরের দিন সকালবেলা উঠে আমরা তৈরী হলাম মালপত্র গোছাতে । হোটেলে একটা Conference-এ যোগ দিতে অনেক লোক এসেছে, তাই Breakfast Hall-এ বেজায় ভীড় । যাই হোক, তারই মধ্যে জায়গা খুঁজে আমরা বসে গেলাম । খাওয়া শেষ করে এরপর আমরা মালপত্র নিয়ে নেমে এলাম হোটেলের ঘর ছেড়ে । এবার একটা ট্যাক্সী ধরে সোজা

বিমানবন্দর - গন্তব্য পাশের দেশ Zambia-র Livingstone শহর । ভূপর্যটক David Livingstone, যিনি ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত আবিষ্কার করেছিলেন Zambia ও Zimbawe এই দুই দেশের সীমানায়, তাঁরই নামে ঐ শহরের নাম ।

[দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে Zambia, Zimbawe ও Botswana-তে আমরা তিন দিন কাটিয়ে আসি । Zim ও Zam-এ অবিরল বৃষ্টির দৌরাত্ম্যে ভিক্টোরিয়ার দৃশ্য দেখা যায়নি ভালো । তবে Botswana-য় Chobe National Park-এর নদী ও জঙ্গলসফর খুবই উপভোগ্য অভিজ্ঞতা -- বিশেষতঃ Chobe Park-এর ৬০ হাজার ঐরাবতের ইতস্ততঃ বিচরণ ও জল নিয়ে খেলা – এত বড় হাতির দল এর আগে কোথাও দেখিনি ।]

Zambia থেকে তিন দিন বাদে আমরা ফিরে এলাম ম্যান্ডেলার দেশে । আমাদের বিমান সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ Capetown Airport-এ নামলো । দিনের আলো তখনও ছিলো বেশ । আমাদের এখানকার সরাইখানার নাম VIP Cape Lodge, ট্যাক্সী নিয়ে আমরা সেখানে এলাম । এটা ঠিক হোটেলের মতো নয়, গেটবন্ধ একটা দোতলা বাড়ী, সামনে একটা ছোট বাগান । আমরা গেটে কয়েকবার ধাক্কা দেবার পরে একটি তামিল তরুণী ওপর থেকে নেমে এসে চাবি দিয়ে দরজা খুলে দিলো, তারপর নিয়ে গেল নীচের তলার একটা ঘরে ।

ঘরটা খাট-বিছানা-টেবিল-চেয়ার দিয়ে Furnished--একপাশে ফ্রীজ-স্টোভ, কিন্ত ঘরে Phone নেই । আমরা তরুণীকে বললাম একটা Pizza আনিয়ে দিতে, রাতের আহার । সে "ঠিক আছে" বলে চলে গেল । Pizza আসতে লাগলো ৩০ মিনিট প্রায়, মেয়েটি আবার গেটের চাবি খুলে দিয়ে গেল ।

রাতের খাওয়ার পরে ঘুমোতে যাওয়ার আগে পরের দিনের শহর পরিক্রমার প্ল্যানটা করতে হবে । অবশ্য দ্রস্টব্যের তালিকায় প্রথমে ছিলো Robben Island -- যেখানে নেলসন ম্যান্ডেলা ১৮ বছর কারাবাসে কাটিয়েছেন, সেখানেই আগে যাওয়া ঠিক । তারপর Table Mountain, Signal Hill এবং অন্যান্য জায়গায় যেতে হবে । সেইমতো আমরা পরদিন সকালবেলা উঠে স্নান-টান সেরে তৈরী হলাম । আগের দিনের বেঁচে যাওয়া কিছু খাবার ছিলো, তাই দিয়ে ব্রেকফাস্ট করা হোল । এখানেও আমরা প্রধানতঃ Hop-on Hop-off বাসেই বিভিন্ন জায়গায় যাবার পরিকল্পনা করেছিলাম । তবে আগে একটা ট্যাক্সী নিয়ে Bus Terminus-এ পৌঁছতে হবে । সেই মতো Lodge-এর মালিকান মহিলাকে বললাম আমাদের একটা ট্যাক্সী আনিয়ে দিতে । তিনি বললেন মিনিট পনের বাদে বেরোলে অফিস যাওয়ার পথে আমাদের নামিয়ে দিতে পারবেন । সেইমতো Ride নিয়ে আমরা Bus Terminus-এ পৌঁছে আমাদের Bus Pass কালেক্ট করলাম । লাল, হলুদ রুটের বাস – যাব Victoria & Alfred Waterfront-এ । বাসটা পাঁচ-ছ জায়গায় থামার পর এলো Waterfront স্টপে । এখান থেকে লঞ্চ ছাড়ে Robben Island যাবার । লাগে কুড়ি-পঁচিশ মিনিট । আমরা হেঁটে গিয়ে Nelson Mandela Gateway Dock-এ নোঙ্গর করা ফেরীবোটে উঠলাম । দশ মিনিট বাদে Boat ছাড়লো । বেলা তখন এগারোটা ।

প্রায় আধঘণ্টা বাদে বোট থেকে নেমে আমরা একটা Tourbus-এ উঠলাম দ্বীপটা একচক্কর ঘুরে আসতে । বাস একবার থামলো একটা Limestone Quarry-তে যেখানে হাড়ভাঙ্গা শ্রম করে কয়েদীরা পাথর ভেঙে খোয়া তৈরী করতেন । অনতিদূরে একটা গুহায় তাঁদের যেতে হতো পায়খানা-প্রস্রাব সারতে । এরপরে বাসটা একটা Cemetery-র পাশ দিয়ে গেল যার নাম Leper Graveyard । আত্মীয়স্বজনহীন কয়েদীদের মৃত্যুর পরে ওখানেই কবর দেওয়া হোতো । এছাড়াও আমরা দেখলাম সারি সারি কারাগার, পরিত্যক্ত সৈনিকাবাস ও আরও কিছু Building ।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের Bustour শেষ হলে একটা পনের মিনিটের বিরতি । বিরতির পরে আমাদের গাইড হয়ে এলেন একজন প্রাক্তন Robben Island কয়েদী । তাঁর সঙ্গে আমরা কারাগার-ভবনের বিভিন্ন অংশ ঘুরে দেখলাম, বিশেষ করে যে প্রকোষ্ঠটিতে ১৮ বছর একা থাকতেন মহামতি ম্যান্ডেলা । অন্য কয়েদীদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশা নিষিদ্ধ!

এইভাবে কারাগার পরিদর্শন সমাপ্ত হলে আমরা আবার ফেরীবোটে উঠলাম । Robben Island থেকে V & A Waterfront-এ ফিরে এসে কিছু খেয়ে নিলাম আমরা । তারপর Harbour থেকে বোটে চেপে চল্লিশ মিনিটের একটা Mini Cruise-এ ঘুরে দেখা গেল Cape Town-এর খানিকটা । ইতিমধ্যে বিকেল হয়ে এসেছে । এবার Signal Hill-এ না উঠলে "Best Sunset of South Afrika" দেখা হয়ে যাবে । না, হেঁটে পাহাড়ে উঠতে হবে না, Hop-on Hop-off বাসেই যাওয়া যায় । তবে Waterfront থেকে সরাসরি যাওয়া যায় না, বাস বদল করতে হবে একবার ।

সেইমত ছোটাছুটি করে আমরা Signal Hill-এ পৌঁছে দেখলাম সেখানে তখনই অনেক লোক জড়ো হয়েছে। সূর্যদেব তখনো পশ্চিম দিগন্তের কিছু ওপরেই আছেন, কিন্তু ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে ইতিমধ্যেই । ওপর থেকে Cape Town শহরের Aerial View চমৎকার । এখানে Sunset হয় জলের ওপরে, সে দৃশ্য আরো মনোরম ।

সূর্য্যাস্তের একটু পরেই আমরা বাসে চেপে Waterfront-এ ফিরে এলাম । ওখানে একটা MacDonald Restaurant ছিল, সেখানেই খাওয়াদাওয়া সেরে একটা ট্যাক্সী ধরে Back to Lodge । আজকের দিন শেষ হয়ে গেল । আগামীকাল Cape Town-এ আমাদের শেষ দিন -- কাল উঠতে হবে এই শহরের সবথেকে উল্লেখযোগ্য Landmark, অর্থাৎ Table Mountain-এ ।

পরের দিন সকাল ছটায় উঠে সুটকেশ গুছিয়ে সাতটার সময় ট্যাক্সী ধরলাম আমরা । Hop-on Hoff-off বাসের অফিসে আমাদের মালপত্র রেখে রেড বাস ধরে Table Mountain স্টপে নামলাম যখন তখন বেলা ৯টা । ইতিমধ্যেই লম্বা লাইন পড়েছে ওপরে ওঠার । Cable Car চেপে উঠতে হবে, তারই জন্য এই লাইন । প্রায় এক ঘণ্টা পরে আমরা Cable Car-এ উঠলাম । পাঁচ মিনিট ধরে সেটা উঠতে থাকলো জনা পঞ্চাশ যাত্রী নিয়ে । থামলো ৩৫০০ ফুট ওপরে । অনেক লোকজনে জায়গাটা জমজমাট - আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম উত্তরদিকে, সামনে Table Bay আর দূরে বিন্দুর মতো Robben Island । দক্ষিন ও পশ্চিমে তাকালে অতলান্তিক সমুদ্র দেখা যায় ।

ক্যামেরায় বিভিন্ন দিক থেকে বেশ কিছু ছবি তোলার পর আমরা নীচে নামার লাইনে দাঁড়ালাম । সেখানে কোনও ভীড় ছিল না । তবে নীচে নেমে Bus Stop-এ কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয়েছিলো । প্রায় বারোটা নাগাদ বাস কোম্পানির অফিসে এসে পৌঁছলাম আমরা । ওখানে আমাদের রাখা মালপত্র নিয়ে আমরা রওনা দিলাম বিমানবন্দরের দিকে । এবার ফেরার পালা । দু-ঘণ্টা পরে ম্যান্ডেলার দেশকে বিদায় জানিয়ে আমাদের বিমান আকাশে ডানা মেলে দিলো । Au revoir!

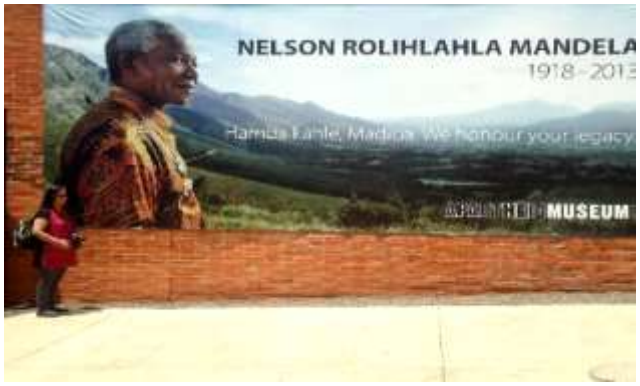

----- XX ----

পুতুল খেলা

নন্দিতা ভাটনগর

সাবেকি বাড়ির দক্ষিণের বারান্দায় বসেছিলেন এক বনেদি পরিবারের শেষ জীবিত পুত্রবধূ সুহাসিনী। উদাস চোখে চেয়ে ছিলেন সামনের রাস্তাটার দিকে। তিনি এসেছিলেন সেই কোন যুগে এ -বাড়িতে যখন ম্যে-বৌদের কোথাও বেরোবার হুকুম ছিল না। অন্দর মহল আর বার মহলের মাঝখানে ছিল এক নিষেধের দেওয়াল। সেই দেওয়ালের দুদিকে থাকত দূত আর দূতীদের আনাগোনা - ছোট, বড় মেজ-সেজ, দাসী আর হুঁকো বরদার, বেয়ারা, জমাদার আর চাকরদের খাস রাজত্ব ছিল সেখানে।

মনে পড়ে সুহাসিনীর তার ছ'বছর বয়সটাকে - যখন তাঁকে গয়নাগাটি শারি-জ্যাকেটের ভারে নুয়ে পড়ে বদ্ধ ফিটনে চেপে দাসীর হাত ধরে আসতে হত এ বাড়িতে । ভাবী শ্বশুর বাড়ির মানুষদের সংগে পরিচয় করিয়ে দেবার এই ব্যবস্থাটি করেছিলেয়ান দুই পরিবারের গুরুজনেরা। ছোট মেয়েটির মতামত কেউ চায় নি। তাকে কেউ জিজ্ঞেস করেনি যে তার ওই ভাবে যেতে ভাল লাগে কিনা। হঠাত পুতুল খেলার মাঝখান থেকে তাকে উঠে আসতে হত। তারপর এ বাড়িতে এলেই বড় বড় পাকা গিন্নীরা, বয়স্ক দাসীরা তাকে দেখত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে । নেড়েচেড়ে দেখত তার ঐ সব ভারি ভারি গয়নাগুলোকে। সুহাসিনীদের পরিবারটিও ছিল সমান ওজনের বনেদি বংশ। ওঁদের কাছের ও দূরের অনেক জ্ঞাতি গোষ্ঠী তখন ছড়িয়ে ছিল বনেদি কলকাতার চতুর্দিকে । সেই গোষ্ঠীর এক পরিবার ছিল জোড়াসাঁকোর বাসিন্দা। ওই পরিবারটির কৃষ্টি ও সংস্কৃতির খ্যাতি তখন সমস্ত কলকাতা কেন সারা ভারতবর্ষেই বিস্ময় ছিল। ওঁদেরই একজন ইতিমধ্যে জগত জিনে নিয়ে এসেছেন সম্মান। ওই বাড়ির মেয়েরা তখন শিখত লেখাপড়া , একটি বউ তো সেই কোন যুগে স্বামীর সাথে আরবী ঘোড়ায় চড়ে ময়দান ঘুরেও এসেছে। কিন্তু সুহাসিনীদের বাড়িতে ত খনও বারো বছর না পড়তেই মেয়েদের বিয়ে হয়ে যেত। ছেলেমেয়েদের জন্মের আগেই হয়ে যেত বাক দান। সুহাসিনীর ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ওঁর ঠাকুরদা কথা দিয়েছিলেন তাঁর যদি প্রথম পৌত্রী হয়, তবে সে এই বাড়ির একমাত্র ছেলের বৌ হবে। সুহাসিনীর জন্মের সময় সেই ছেলেটির বয়স দশ; তাকেও কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনি। কিন্তু তার কুড়ি পঁচিশ বছরের মধ্যেই যুগ বদলের হাওয়া লেগেছিল এ বাড়িতে । তার পর তো সুহাসিনীর নিজের মেয়েরাই অন্দর মহলের বাধানিষেধের গন্ডী পেরিয়ে চলে এল বাইরের আলোয় ভরা আঙিনায় । ওদের মা হয়ে তিনিও অনেক কালের সেই বাঁধনটাকে ছিঁড়ে ফেলে বেরিয়ে এসেছিলেন, আর পেছনে ফিরে তাকান নি। অবশ্য এর পেছনে তাঁর স্বর্গত স্বামীর সস্নেহ উৎসাহ আর ভালবাসা না থাকলে যে কী হত তা বলা শক্ত। কিন্তু সুহাসিনীও নিজের জোরে এগিয়ে গিয়েছিলেন, থামেন নি কোথাও। তাঁর চিরটা কাল মনে হয়েছে সামনে তাকিয়ে পথ চলাটাই জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। সেই যে উপনিষদে কোন ঋষি বলে গেছেন 'চরৈবেতি', এগিয়ে চল, এগিয়ে চল। ওইটিই তাঁর মূলমন্ত্র, ছেলেমেয়েদেরও বলেছেন সেই কথা বার বার। আজ শহরতলি আর শহরের মেয়েদের মাঝখানে তিনি গড়ে তুলেছেন নিজের কর্মক্ষেত্র। সেই পথ ধরে এসেছে খ্যাতি, এসেছে সম্মান...সেই অল্পশিক্ষিতা বৌটিকে তুলে নিয়ে গেছে আজ অসাধারণ পর্যায়ে। এখন বেতার, দূরদর্শনের আহ্বানও আসে তাঁর কাছে সাক্ষাৎকারের জন্য- অবাকই লাগে ভাবলে। জীবনের প্রান্তবেলায় বসে বসে সেই কথাগুলোই আজ আসা-যাওয়া করছিল তাঁর মনের মধ্যে।

আজকে সুহাসিনীর এক মেয়ে আসছে ক্যানাডা থেকে কয়েক সপ্তাহের জন্য। কতদিন দেখেন নি মেয়েকে। সকাল থেকে তাই অপেক্ষায় বসে আছেন এই বারান্দায়। ওঁর ছেলেমেয়েরাই এখন জীবনের সব চেয়ে দামী জিনিস। ঐ ভারী ভারী গয়নাগুলোর চেয়েও অনেক বেশি দামি। ওদের আর ওদের ছেলেমেয়েদের ভেতর দিয়েই জগতটাকে চিনে নেন তিনি; দেখতে পান যুগ বদলের হাওয়াটা লেগেছে কোন পালে।

ট্যাক্সিটা এসে থামল। ঝুঁকে পড়ে দেখলেন সুহাসিনী - পর্ণা নামল একাই। মেয়ের শান্ত বিষণ্ন মুখখানা দেখে তাঁর বুকের মাঝখানটা একবার মুচড়ে উঠল। পর্ণার সদানন্দ, সদাহাস্যময় স্বামী অকালে পাড়ি জমিয়েছে ওপারে। তার পর এই প্রথম মেয়ে আসছে মায়ের কাছে। তিনি তো জানেন পর্ণাকে শক্ত মাটিতে দাঁড়াতে হবেই, আর মা হয়ে তিনি সেই কথাটা যদি বোঝাতে পারেন, তবেই তাঁর মা হওয়া সার্থক। সুহাসিনী আস্তে আস্তে অথচ দৃঢ় পায়ে নেমে এলেন নিচে। পর্ণা প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই সুহাসিনী ওকে বুকের মধ্যে টেনে নিলেন। মায়ের বুকে মুখ গুঁজে পর্ণা বলল "মাগো, আমি যে কাঁদতে পারছি না। কষ্টে বুক ফেটে যাচ্ছে, তবু পারছি না "। মা বললেন শান্ত গলায় "কান্নারও কিছু প্রয়োজন আছে জীবনে, আর সেই প্রয়োজনও সামান্য নয়। কিন্তু চোখের জল বড় নিজস্ব ধন, বড় দামি। যেখানে সেখানে ফেল না, যে বুঝবে তোমার এই কষ্ট, যে তোমার মনটাকে ছুঁতে পারবে, তেমন লোকের সামনেই ফেল। নইলে অমন মূল্যবান অনুভূতির অপব্যয় হবে"। মেয়ের হাতখানা ধরে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে আবার বললেন তিনি "আনন্দটাও কিন্তু জীবনের একটা অপরিহার্য অংশ। সেটাকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র কান্না দিয়ে জীবনটাকে ভরে রেখ না; আনন্দের মধ্যেই খুঁজে পাবে জীবনের অর্থ, বেঁচে থাকার তাতপর্য "। এতদিনে পর্ণার বুকের পাথরটাতে যেন লাগল পরশমণির ছোয়া, আর সেই পাথর গলে সোনার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে গেল ওর এতদিনের কান্নাটিকে। মা-মেয়ে উঠে এলেন ওপরে।

কেটে গেল কয়েকটা দিন নানা ব্যস্ততায়। রোজ রাত্রে মা মেয়েতে নানা পুরনো কথা হয় শুয়ে শুয়ে। পর্ণা জিজ্ঞেস করে "আচ্ছা মা, আসতে তো এ বাড়িতে সেই কোন ছোটবেলা থেকে, বাবাকে দেখনি কখনও?"

"কেন দেখব না? ওই তো বাড়ির চত্বরে সে পায়ে চাকা-লাগানো কী একটা পরে দৌড়ে বেড়াত । পরে জেনেছি সেটা ছিল রোলার স্কেট। আমিও একদিন পরতে চেয়েচিলুম, কিন্তু মোটেই পাত্তা দেয় নি। "

পর্ণা হেসে ফেলে।

"মাগো, কী করে তুমি ভেবেছিলে যে সেই যুগে বাড়ির হবু বৌকে রোলার স্কে ট পরে দৌড়তে দেবে কেউ?"

"মুশকিলটা ছিল তো সেখানেই বে। ওই যুগের সেই অন্যায় অনুশাসনটা মানতে যে ইচ্ছে করত না আমার। জানিস -" উত্তেজনায় উঠে বসলেন তিনি। "শুনতে পেলুম দাসীদের সুপুরি কাটার দংগলের মধ্যে বসে একদিন, একরকমের গাড়ি চলেছে কলকাতার রাস্তায়। সাপের মত আঁকাবাঁকা লাইন পাতা হয়েছে। তার ওপর দিয়ে চলে ঝকঝকে দুটো গাড়ি, একসঙ্গে জোড়া । ওগুলোকে নাকি বলে ট্রাম গাড়ি । ব্যস, আমি মনে মনে ঠিক করে ফেললুম ওই গাড়িতে একবার চাপতে হবেই হবে।"

"চাপতে গেলে তো ভাড়া লাগত। সেটা কি করে জোগাড় করবে ভেবেছিলে?"

"দাসীদের কাছ থেকেই জেনে নিলুম ভা ড়া কত। পান সাজার জন্য কিছু দিতেন ঠাকুরমা। সেইটুকুই জমিয়ে জমিয়ে একদিন রওনা দিলুম সেই ট্রামগাড়ির এ্যাডভেঞ্চারের উদ্দেশ্যে। তখন দাসীদের দল মেঝেতে আঁচল বিছিয়ে শুয়ে পড়েছে । মা ঠাকুরমারাও যে যার ঘরে চুল এলো করে শুয়ে পড়েছেন । চারিদিকে নিঝঝুম, বাইরে দারোয়ানজী ওই সময়ে খৈনি টিপতে টিপতে ঝিমিয়ে নেয় - সেটাও জানা ছিল। পা টিপে টিপে দুটো মহল তো পেরোলুম। প্রায় পৌঁছে গেছি সিং দরজার কাছটিতে - আর দু'পা, তারপরই সেই ট্রামগাড়ির রোমাঞ্চময় জগত। যেই না পা বাড়িয়েছি - হঠাত টান পড়ল বিনুনিতে - মায়ের খাস দাসী সুন্দরীর বাউটি পরা হাতের টা ন। একটানে আমার সামনে থেকে সরে গেল

সেই খোলা আকাশের জগতটা। মুছে গেল ট্রামগাড়ি আর সেটাকে ঘিরে শত রকমের রোমাঞ্চ। ঘুচে গেল আমার ট্রামগাড়িতে চাপার সাধ।"

"কিন্তু মা, তুমি তো তারপর কতবার চড়েছ ট্রামে - এমন কি এই আধুনিক পাতাল রেলেও। তারপরও সেই দুঃখটা ভোলো নি?"

" নারে, ভোলা কি যায়? নিজে নিজে সেই নিষেধের গন্ডীটাকে পেরোবার সাহস, সেই নীরব বিদ্রোহ - তার কি কোন তুলনা আছে?"

পর্ণা দুহাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে বলে "মাগো, এখন বুঝি, তুমি কেন আমাদের সকলকে এমন করে বাইরের দিকে ঠেলে দিয়েছিলে"।

আরো চলে গেল কয়েকটা দিন। একদিন পর্ণা বলল "মা, কত জঞ্জাল জমে রয়েছে এই দেওয়াল-আলমারিগুলোতে। একটু পরিস্কার করে কিছু জিনিসপত্র ফেলে দিই যদি বল। " সুহাসিনীরও আপত্তি নেই তাতে। এ বাড়ির বহু প্রাচীন জিনিসও রয়েছে ওই আলমারির মধ্যে। ছেলেমেয়েদের অনেক দিয়েও দিয়েছেন তিনি। কিন্তু তাদের ছোট সংসার, ছোট বাড়ি । তারা সব নিতেও চায় না। অথচ নিজের হাতে ফেলতেও পারেননি; পর্ণা যদি পারে করুক না।

পর্ণা বসে গেল সাবানগোলা জল আর ক্যানাডা থেকে আনা স্পঞ্জ নিয়ে। সারাটা দিন ধরে অনেকটা পরিচ্ছন্নও করে আনল সে। তারপর বসল মায়ের পুতুলের আলমারিটা গোছাতে। সুহাসিনীর সাতটি ছেলেমেয়ে বরাবর দেখে এসেছে তাদের মায়ের বড় পুতুলের শখ। তাই তারা, বিশেষ করে তাঁর বিদেশবাসী ছেলেমেয়েরা, যেখানে যখন নতুন ধাঁচের পুতুল দেখে, এনে দেয় মাকে। নতুন কোন পুতুল দেখলেই মায়ের মুখখানা এখনও কেমন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সেটা ভেবেই হাসি পেল পর্ণার। হঠাত তার চোখ পড়ল আলমারির একটা তাকের পেছনের দিকে, কয়েকটা পুরনো চীনেমাটির, সেকুলয়েডের আর পোড়ামাটির পুতুল রয়েছে সেখানে। সেগুলোকে বের করে দেখল - কোনটাই আস্ত নয়। একটার নাক থেবড়ে গেছে, অন্যটার হাত নেই, আবার আরেকটার পায়ের দিকটাতে চিড় ধরেছে। পোড়ামাটির পুতুলগুলোর তো রঙ উঠে নাক মুখ সব মুছেই গেছে একে বারে - সবকটাই অত্যন্ত পুরনো আর শ্রীহীন। এগুলো ফেলে দিলে মা নিশ্চয়ই খুশি হবেন। তবু ফেলে দেবার আগে মাকে একবার দেখানো উচিত। পর্ণা ডেকে আনল সুহাসিনীকে । "মা, দেখ তো এই হতকুচ্ছিত পুতুলেগুলোকে। তোমার এত পুতুল, এগুলোকে রাখবার কোন দরকার আছে কি? "

হঠাত সুহাসিনী যেন আ কুল হয়ে উঠলেন, দুহাত বাড়িয়ে সেই আধভাঙ্গা, বিকলাংগ পুতুলগুলোকে টেনে নিয়ে বললেন "না, না, এগুলো ফেলিস না। থাক না এগুলো, কতই বা জায়গা নিচ্ছে - এতই যখন রয়েছে"। তার গলায় কেমন একটা ছেলেমানুষী আবদার ফুটে উঠল। পর্ণা অবাকই হল তার স্থির, ধীর, বুদ্ধিমতী মায়ের এই চাঞ ল্য দেখে। কিন্তু তখন আর কিছু বলল না সে। আবার ঝেড়ে মুছে ঢুকিয়ে দিল পুতুলগুলোকে আলমারির মধ্যে।

সেদিন রাত্রে আবার মা মেয়ের শোবার সময় এল। মায়ের পাশটিতে ছোটবেলাকার মত গুটিশুটি মেরে শুয়ে পড়ে পর্ণা বলল "আচ্ছা মা, সত্যি বল তো কি হবে ওই ভাঙ্গা পুতুলগুলোকে রেখে। আমরাও খেলিনি ওগুলোকে নিয়ে। আর তোমার আধুনিকা নাতনীরাও তো বড়ই হয়ে গেছে। তাছাড়া ওসব তারা বোধহয় ছুঁয়ে ও দেখত না"। সুহাসিনী ওকে কথা শেষ করতে দিলেনা না। "ওরে, তোরা কী বুঝবি? আমার তো সেই বিয়ে হয়ে গেল বারো বছর বয়সে। পুতুলে নিয়ে খেলতে খেলতে কখন দেখি সেই খেলাঘরের সংসার থেকে জোর করে নিয়ে গেল আমাকের সবাই সত্যিকারের সংসারে। সেখানে কল্পনা বলে কিছু ছিলা না। ছিল না আ পন মনে নিজের কোণটাতে লুকোবার অবকাশ। সেখানে সবাই বড় বাস্তব, বড়ই প্রকট। বিয়ের ঠিক পরেই কদিন বাদে যখন প্রথম বাপের বাড়িতে এলুম মাথার ঘোমটা ফেলে দিয়ে, একটা মস্ত দম নিয়ে প্রথমেই ছুটেছিলাম আমার পুতুলের সংসার দেখতে। গিয়ে দেখি সব ফাঁকা । খুড়তুতো, মাসতুতো

ছোট বোনগুলো তক্কে তক্কে ছিল, কবে দিদিভাই শ্বশুর বাড়ি যাবে, আর সেই পুতুলগুলো ওদের হয়ে যাবে। আমার মা সেটা জানতেনও। তাই তিনি সেগুলো ওদেরই দিয়ে দিয়েছিলেন। এটুকু বোঝেন নি যে বারো বছরের ছোট্ট মেয়েটার পুতুলখেলা তখনও শেষ হয়নি। কী কষ্ট যে হয়েছিল সেদিন। কি করে তা বোঝাব তোকে এতদিন পরে। পা ছড়িয়ে বসে কেঁদেছিলুম আমার সেই পুতুল ছেলেমেয়েদের শোকে। দু'চারটে অবশ্য ফেরত পেয়েছিলুম সেবারে। মা হয়তো ব্যথাটা খানিক বুঝেছিলেন। সেইগুলোই ওই পুতুল, ওদের নিয়ে খেলা আর হয়নি আমার। তেরো পুরে চোদ্দতে পা দিতেই কোলে এল তোর বড়দি । একে একে এল তোর দাদা দিদিরা। জ্যান্ত পুতুলরা এসে গেল সত্যিকারের সংসারে। ওই প্রাণহীন জড় পুতুলগুলো রয়েই গেল আলমারির কোণে। কিন্তু কি জানিস? ওই সঙ্গে রয়ে গেল গারো বছরের সেই কান্ডজ্ঞানহীন মেয়েটার পুতুলখেলার সাধ। ওগুলোকে ফেলে দিলে যে সেই অপূর্ণ সাধটাকেও ফেলে দেওয়া হবে, আর চিরদিনের মত হারিয়ে যাবে সেই বারো বছরের ছোট্ট অবুঝ মনটা। " [মুখে শোনা স্মৃতিচারণা অবলম্বনে]

----- XX -----

তবে কেন মিছে ভালবাসা

ঝর্ণা চট্টোপাধ্যায়

চার মাস জাহাজের আশ্রয়ে ভেসে বিশ্ব-ভ্রমণের মধ্যে স্বাভাবিক ভাবেই অনেকটা সময় কেটেছে বিশাল প্রশান্ত মহাসাগরে, আর বেশ কিছু দিন ভারত মহাসাগরে, এ্যাটলান্টিকেও। বিশেষ করে প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝে ভেসে থাকবার সময় যাত্রার বিস্তারিত সংবাদ-বহ মনিটরের দিকে তাকিয়ে অথবা বাইরে তাকিয়ে মনে হোত সারা পৃথিবীতে বুঝি আমরা একা - আর কেউ কোথাও নেই - দিনের পর দিন, রাতের পর রাত জল ছাড়া কিছু চোখে পড়ে না, দ্বীপও নয়, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্বত, কিচ্ছু না। জনবসতির তো কথাই নেই। জলের সুগভীরে তিমির মত বিশাল প্রাণী থেকে শুরু করে ছোট্ট মাছ পর্যন্ত যাই লুকোনো থাক , ওপরে প্রাণী বলতে মাঝে মাঝে শুধু রূপোলী উড়ুক্কু মাছের ঝাঁক আর ঢেউয়ের মাথায় দলবদ্ধ ডলফিনদের খুশির নাচ। তিমির লেজ বা নিঃশ্বাসের ফোয়ারাও কদাচিত। স্থল থেকে বহু দূরে সী-গাল বা শঙ্খচিলেদেরও দেখা নেই। তবে সমুদ্রের বিচিত্র রূপ দেখে মুগ্ধ-বিস্ময়ে চেয়ে থাকতাম নির্নিমেষে । ছোট ছোট ঢেউয়ের মালা বুকে নিয়ে সে কখনও শান্ত , কখনও প্রলয়ঙ্করী, কখনও মেঘের ছায়ার নীলাম্বরী অঙ্গে জড়িয়ে ঘন নীল, কখনও ডোবা প্রবালদ্বীপের ওপরে অর্ধ-চন্দ্রাকার-রেখায় ঘেরা অগভীর জলে তুঁতে থেকে সবজে নীল , কখনও বাতাসের অবিশ্রাম হাহাকারের সংগে সুর মিলিয়ে - ভয়-জাগানো উত্তাল কালচে-নীল ঢেউয়ের মাথায় শাদা ফেনার দুরন্ত উচ্ছ্বাস, আবার সূর্যাস্তের বা সূর্যোদয়ের সময়ে তার ময়ূরকণ্ঠী লাল-নীল-গোলাপী-সোনালী আঁচল-দোলানো মনমোহিনী রূপ। সূর্যের সাথে তখন যেন তার অন্তরংগ প্রেমের খেলা। রহস্যময়ী, চিরচঞ্চলা, অভিসারিনী।

অনেক রাতে নির্জন নয়- বা দশ- তলায় খোলা ডেকে গিয়ে ডেক চেয়ারে শুয়ে শুয়ে ঘন অন্ধকার আকাশে তারা দেখার শখ হোত। অত রাতে অন্যদের বিরক্ত করব না ভেবে কাউকে ডাকতে চাইতাম না। তাছাড়া যারা ঘুমোয়নি তারা তখন মুভী কিংবা চিত্তাকর্ষক সংগীত , বা অন্য কিছু দেখছে, শুনছে। জানি এখানে আমি নিরাপদ, একা গেলেও কিছু ভয় নেই। সমুদ্র-জলের ছল ছল শব্দ ভেসে আসত, নীচে আটতলার ডেকে একটা ছোটখাট সুইমিং পুলেও তার মতই ক্ষুদ্রাকারে ঢেউএর কলতান, যেন সাগরের প্রতিনিধি। ওই সময়ে পুলে কেউ নেই, বারও বন্ধ হয়ে গেছে। শুধু দু-একটা

আলো। বেশ শান্তিময় পরিবেশ। আটতলা থেকে সিঁড়ি বেয়ে ন-তলা বা দশ তলায় যাওয়া যায়, আবার এলিভেটরেও ওঠা যায় অন্য দিক থেকে।

ঐ রকম শুয়ে শুয়ে একদিন লক্ষ্য করলাম দূরে অন্ধকার কোণে রেলিং এর ধার ঘেঁসে কেউ একজন দাঁড়িয়ে । একটু ভয় হোল - কে জানে কে আবার এই সময়ে কি মতলবে এসেছে, কেন-ই বা দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। ভাল করে চেয়ে দেখলাম, মনে হোল একটি মেয়ে, অল্প বয়েস, বোধ হয় ইউনিফর্ম পরা। খুব সম্ভবতঃ রেস্টোর‍্যান্টে কাজ করে, অতিথিদের খাবার-পানীয় পরিবেশন করে, তাদের যত্ন করে। একবার মনে হোল ডেকে কথা বলি, আবার ভাবলাম, বেচারী সমস্ত দিন খেটে-খুটে একটু বিশ্রামের আশায় নিরালায় এসেছে , থাক, ওকে আর এখন ডাকব না। আধঘণ্টা খানেক শুয়ে রইলাম, আকাশের দিয়ে চেয়ে। ওই তো চিরপরিচিত কালপুরুষ , প্রায় মাথার ওপরে। আরও শত সহস্র ঝিকমিকে হীরে-মাণিক তারা, শহরের আলোক-দূষণে এত তারা তো দেখতে পাই না। এই বিশাল বিশ্বের মাঝে আমরা কতটুকু, এই সব ভাবছিলাম শুয়ে শুয়ে। তার পরে উঠে চলে আসার সময়ে আবার সেই কোণে তাকিয়ে দেখলাম, মেয়েটিকে আর দেখতে পেলাম না, কখন নিঃশব্দে চলে গেছে সে। মনে হোল খুব হাল্কা একটু ফুলের সুগন্ধ রয়ে গেছে তার পিছনে।

এর পরে বেশ কিছুদিন রাত্রিবেলা যাওয়ার সুযোগ হয়নি ওপরের খোলা ডেকে । বন্দরে জাহাজ থামলে আমরা যাত্রীরা স্কুল-থেকে ছুটি পাওয়া ছেলেমেয়েদের মত সাগ্রহে বেরিয়ে পড়ি । কাঁধে জলের বোতলসহ ঝোলা আর ইন্টারনেটে সবার সাথে যোগাযোগ করার জন্য আই-প্যাড বা ফোন, হাতে ক্যামেরা, মাথায় রোদের তাপ থেকে বাঁচার আশায় হালকা সূতোর টুপি। সারাদিন নতুন নতুন শহরে-গ্রামে, দ্বীপে-অন্তরীপে, সাগর-বেলায় অথবা বনে-উপবনে অজানাকে জানার নেশায় আর সৌন্দর্য-পিপাসায় ঘুরে ঘুরে দিনের শেষে ক্লান্ত শরীর আর পূর্ণ মনে জাহাজে ফিরি , স্নান-খাওয়া সেরে একটি বই হাতে নিয়ে শুতে চলে যাই। ঠিক বালিশের কাছে আলো জ্বালানো-নেভানোর সুইচটা তখন খুব ভাল লাগে। অথবা কোনও কোনও দিন খুব ভাল গান -বাজনার প্রোগ্রাম থাকলে তাই দেখতে অডিটরিয়ামে চলে যাই কিছুক্ষণের জন্য। খুব ঘুম পেলে ঘরে ফিরি।

কিন্তু আবার একদিন মনে হোল একটু যাই ওপরে । তিথিটা বোধহয় অমাবস্যা ছিল, তাই মনে হোল আজ আরও বেশি তারা দেখতে পাব। অর্থাৎ চাঁদের আলো এসে তারার স্নিগ্ধ দ্যুতি ম্লান করে দেবে না। সেদিন ওপরে গিয়ে দেখি সত্যিই খুব অন্ধকার চারিদিকে। গা ছমছম করতে লাগল। জোর করে সাহস আনলাম মনে - কি আর হবে এখানে? একটু ক্ষণ থেকে ঘরে ফিরে যাব। প্রথমে মনে হোল আমি একাই। কিন্তু একটু পরে চোখে অন্ধকার সয়ে গেলে দেখলাম সেই মেয়েটি সেদিনও চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে রেলিং ধরে, বাইরে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে। সেই চেনা ফুলের মৃদু সুবাস। একা থাকতে ভাল লাগছিল না, তাই এক-পা দু-পা করে এগিয়ে গেলাম সেই দিকে। হঠাত মেয়েটি যেন চমকে উঠল, মুখ ফেরাতে দেখলাম তার দু চোখ উপচে নেমেছে জলের ধারা। ওর আরও কাছে এগিয়ে যাব-কি-যাব-না ভাবতে ভাবতেই একটু শব্দ হোল পিছনে , খোলা সিঁড়ি দিয়ে কেউ যেন ওপরে উঠে আসছে। আমি সেদিকে একবার তাকিয়ে আবার রেলিং-এর দিকে ফিরে তাকালাম - কিন্তু সেই এক মুহূর্তের মধ্যে মেয়েটি কোথায় মিলিয়ে গেছে , একেবারে অদৃশ্য। সিঁড়ি বা এলিভেটরের দিকে তো তাকে যেতে দেখিনি! তাহলে গেল কোথায়? হতবাক হয়ে কি করব ভাবছি, এর মধ্যেই জাহাজের ইউনিফর্ম-পরা একজন কর্মচারী নীচে থেকে ওপরের ডেকে উঠে এলেন, কোন কাজে। আমাকে দেখে একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন "ম্যা'ম, আপনি এখানে, এত রাতে?" আমি সে কথার উত্তর না দিয়ে উত্তেজিত হয়ে রেলিং এর দিকে ছুটতে ছুটতে বললাম , "ঐ যে, একটি মেয়ে, এখানে একা দাঁড়িয়ে ছিল - হঠাত কোথায় চলে গেল, পড়ে যায়নি তো? আমি তো কিচ্ছু বুঝতে পারছি না - এখন কি হবে?" ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন আমি যেখানে দেখালাম সেই দিকে। কিন্তু কারও কোনও চিহ্ন নেই - সমুদ্রও ঠিক যেমন ছিল তেমনি শান্তভাবে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে চলেছে। ভদ্রলোক একটুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন "ম্যা'ম, আপনি বোধহয়

ঘুমিয়ে পড়েছিলেন , হয়তো স্বপ্ন দেখেছেন। তবু আমি একবার ভাল করে সার্চ লাইট দিয়ে দেখছি । আর তেমন দরকার মনে হলে এমারজেন্সী ব্যবস্থা যা করার তা করব। আপনি আপনার ঘরে ফিরে যান, বিশ্রাম করুন। চিন্তা করবেন না।" উপায়ান্তর না দেখে আমি চলে এলাম, কিন্তু ভাল করে ঘুমোতে পারলাম না। সত্যিই কি আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম? তাহলে আগের দিনও তাই? দু দিন কি করে একই রকম স্বপ্ন দেখলাম?

পরের দিন ব্রেকফাস্ট খেতে গিয়ে আমি রেস্টোর‍্যান্টের পরিষেবিকা একটি মেয়েকে জিজ্ঞেস করলাম "তোমাদের মধ্যে কেউ কি ওপরের ডেকে রাতের দিকে যাও?" প্রশ্ণ শুনে ও কেমন করে যেন তাকিয়ে রইল আমার দিকে। উত্তর দিল না। পরে আমি ওদের একজন বয়স্ক সুপারভাইজারকে দেখতে পেয়ে তাকে আগের রাত্রের ঘটনা বলে জিজ্ঞেস করলাম "তুমি কি জানো, কাল রাত্রে একটি মেয়েকে খুঁজে পাওয়া গেছে কিনা ওপরের ওই খোলা ডেকে ?" ভদ্রলোক আমাকে খুব মৃদুস্বরে বললেন "ম্যা'ম, একটু ঐদিকে গিয়ে বসবেন চলুন , বলছি।"

শুনলাম। দীর্ঘ, চিরন্তন করুণ কাহিনী - এখানে একটু সংক্ষেপেই বলছি। এই জাহাজের কাফেটারিয়া-জাতীয় রেস্টোর‍্যান্টে অনেক ইন্দোনেশিয়ান অল্পবয়সী ছেলে-মেয়ে কাজ করে। তাদের অতিথিসেবার তুলনা নেই । সদা হাসি মুখ, মিষ্টি ব্যবহার, অক্লান্ত, অভ্রান্ত পরিষেবা। আমি নিজের চা-টুকু নিজে বানিয়ে আনলেও তাদের অনুযোগ শুনতে হয়, "মামা ঝর্ণা, বলোই না ঠিক কেমন চা তোমার পছন্দ, আমি ঠিক তেমনি করে তোমায় বানিয়ে এনে দেব।" আর এরা সবাই সাধারণতঃ দেখতেও সুন্দর । বিশেষতঃ মেয়েগুলি দেখতে ভারী মিষ্টি, কমনীয় লাবণ্যে ভরা।

বছর কয়েক আগে এই রকম একটি মেয়ে কাজ করত এখানে, আর স্বভাবতঃই তার গুণগ্রাহীর অভাব ছিল না। জাহাজের একজন উচ্চপদস্থ, সুদর্শন, মাঝবয়সী কর্মচারীও তার মধ্যে একজন। তিনি প্রায় এক বছরের জন্য এই জাহাজে একজন অফিসার হয়ে এসেছিলেন। সন্ধ্যে বেলায় তিনি এসে সব সময়ে সেই মেয়েটির দায়িত্বের এলাকাটিতেই ডিনার খেতেন, আর যতক্ষণ থাকতেন ততক্ষণ ওর দিকে তাকিয়ে থাকতেন। মুগ্ধ দৃষ্টির অনিবার্য আকর্ষণে তার পরে একটু একটু করে আলাপ হোল দু' জনের। জাহাজ যেদিন যেদিন বন্দরে সারা রাত্রির জন্য থামত, সেই সব সন্ধ্যায় ওর কাজ থেকে ছুটির জন্য অপেক্ষা করে থাকতেন তিনি , তার পর ওকে নিয়ে যেতেন সেই সব শহরে বা গ্রামে বেড়াতে, আর একসাথে বাইরে কোথাও ডিনার খেতে। এর ফলে অন্তরঙ্গতা দ্রুত গতিতে এগিয়ে গেল। তিনি হেসে ঠাট্টার ছলে সবাইকে বলতেন "ও আমার গার্ল ফ্রেন্ড"। আর মেয়েটি ওর বন্ধুদের কাছে চুপি চুপি বলত "আমি ওর প্রেমে পড়ে গেছি। ওকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। ও বলেছে আমাকে জানাবে বাড়ি ফিরে গিয়ে, এর পরে কি করে আবার দেখা হবে, কি করে সারা জীবন আমরা একসাথে থাকতে পারব।"

তার কিছুদিন পরে কাছে এল ভদ্রলোকের বিদায় নেবার পালা । তাঁর কন্ট্রাক্ট শেষ হবে দু-এক সপ্তাহের মধ্যে। উনি নেমে যাবেন এর পরের বন্দরে, তাঁর পূর্ব জীবনে। কিন্তু যাবার আগে করুণ মুখে তিনি মেয়েটিকে জানালেন যে উনি অন্য রকম ভেবেছিলেন, এখন বুঝতে পারছেন সে-ভাবা নিতান্তই দিবা-স্বপ্ন। ওঁকে ফিরে যেতে হবে স্ত্রী-পুত্র-কণ্যা নিয়ে তাঁর ভরা সংসারে। সেখানে ঐ মেয়েটির কোনও স্থান নেই। কিন্তু তিনি ওকে কোনদিন ভুলতে পারবেন না। তাই সে যেন তাঁকে তাঁর ভুলের জন্য ক্ষমা করে দেয়।

তার পর? তার আর পর নেই। একদিন রাতে তার কাজ শেষ হবার পরে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি । সবাই সন্দেহ করে যে সেই অমাবস্যার রাতের গভীর অন্ধকারে মেয়েটি উত্তাল সমুদ্রে ঝাঁপ দেয় । তার অনুপস্থিতি জানাজানি হতে যতখানি সময় লেগেছিল ততখানি সময়ে জাহাজ চলে এসেছে অনেক দূর, তবুও নানা ভাবে খোঁজাখুঁজি হয়েছিল - কোস্ট গার্ডদের খবর পাঠিয়ে ব্যবস্থা করে ডুবুরী থেকে শুরু করে হেলিকপটার , স্টীমার, ছোট নৌকো নিয়ে - রেসকিউ অথবা রিকভারি, কিন্তু সবই নিস্ফল হয়েছিল। অসীম অভিমান বুকে নিয়ে অসীম সমুদ্রের অতল গভীরে সে আশ্রয় নিয়েছে।

শুধু কখনও কখনও ক্বচিত কোনও অন্ধকার রাতে , বিশেষতঃ অমাবস্যা তিথিতে কেউ কেউ ওকে এখনও দেখতে পায় ওপরের খোলা ডেকের রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে, আর নিঃশব্দে চোখের জল ফেলতে। ও, হ্যাঁ - মেয়েটি নাকি রজনীগন্ধা ফুল খুব ভালবাসত , ঐ গন্ধের একটা পারফিউম ব্যবহার করত জাহাজ থেকে বাইরে বেড়াতে যাবার সময়। আর ঐ দামী পারফিউমটি ছিল সেই প্রেমমুগ্ধ ভদ্রলোকের উপহার ।

----- XX -----

বাস্তু-সাপ

মদনমোহন ঘোষ

সেদিন ছিল রবিবার। শীত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাদের বাড়ির পাঁচিলের এককোণে হুমড়ি খেয়ে পড়া পুরানো বিশালাকার কাঁঠাল গাছটাতে আবার পাতা গজাতে শুরু করেছে। সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে সুপারি বাগানের ভেতর দিয়ে বড়জোর দুশো মিটার গেলেই সুভাষদের বাড়ি। জমিদারবাড়ির এই অংশটাকে পশ্চিমের-বাড়িও বলা হয়। অন্য অংশটাকে পূবের-বাড়ি বলে। দুই বাড়ির মাঝে পূজোর দালান। পুরানো বাড়ির বাইরের দিকের প্লাস্টার খসে গিয়ে ইট বেরিয়ে এসেছে। সুপারি পাতার খোলের উপর ভাইকে বসিয়ে টানতে টানতে ওদের বাড়ির দিকেই এগুচ্ছি। সুপারি বাগানে কখনও সখনও হেলে সাপ ব্যাঙ তাড়িয়ে খায়। আবার কখনও বা বিষধর সাপের দর্শন মেলে। পাশেই বাঁদিকে পূবের বাড়ির সংলগ্ন একটা পড়ো ঘর বছরের পর বছর তালা বন্ধ পড়ে আছে। ঐ অন্ধকার ঘরে কত যে চামচিকে আর সাপ আছে কে জানে। সবমিলিয়ে কেমন গা ছমছমে ভাব। বাগান পেরিয়ে আসতেই দেখলাম পশ্চিম-বাড়ির সামনে একদল লোক ভিড় করেছে। ভিড় ঠেলে এগিয়ে যেতেই ঘটনাটা জানতে পারলাম।

দোতলা বাড়ির নিচের তলায় সিঁড়ির নিচে ঘুলঘুলির পাশ দিয়ে সুভাসের কাকিমা কলঘরে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটা শব্দে কাকিমা ঘুলঘুলির নিচে তাকালেন। তারপর যা দেখলেন তা নিয়েই এই গল্প। তবে গল্প হলেও ঘটনাটা সত্যি। অন্ধকারে ভালো দেখা যাচ্ছে না তবে ফোঁস ফোঁস শব্দে ওটা যে সাপ সে নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। ভুলু-দা তাড়াতাড়ি ওপরের ঘর থেকে টর্চ-লাইটটা এনে যেমনি ফোকাস করলেন ওমনি ঘুলঘুলির ভেতরটা ঝকঝক করে উঠল। হলদে আলোর ছটায় দেওয়াল ভরে গেল। ঘুলঘুলির মধ্যে ঠাকুমার পানের ডাবর, ডাল ভাঙার যাঁতা, একটা ধামার মধ্যে কিছু ধান, তার পাশে এক কাঁদি কলা আরও কত কি। রাতে এই ঘুলির মধ্যে আরশোলার উৎপাত। আরশোলা খাওয়ার জন্য কুনোব্যাঙেরও আসাযাওয়া আছে এখানে। ঘুলঘুলির এক কোনে বিঘত খানেক ফাঁকা যায়গা। আর ঠিক ওখানেই তিনি এক হাত ফনা তুলে কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছেন। ফনার দুপাশে মহাদেবের খড়মের মত চিহ্ন দেখে বোঝা যাচ্ছে এটি বিষধর গোখরো সাপ। টর্চ-লাইটের আলোয় সাপটা বোধহয় উপস্থিত কাউকেই দেখতে পাচ্ছে না। নড়াচড়া করছে না তবে মাঝে মাঝে জিভ বের করছে। কিন্তু ওখানে ওভাবে সাপটা থাকা নিরাপদ নয়, যেকোনো মুহূর্তে কাউকে কামড়ে ওর বিষ ঢেলে দিতে পারে। বাড়িসুদ্ধ সবাই সমূহ বিপদের আশঙ্কা করছে। অবশ্য ব্যাঙের খোঁজে কখনও কখনও সাত

আট হাত লম্বা দাঁড়াশ সাপও এখানে আসে। যার বিষ নেই, কাউকে কোনও দিন কামড়েছে এমন শোনা যায় না। তাই তেমন ভয় নেই। সিঁড়ির দরজা খুলে দিয়ে মেজেতে খট খট আওয়াজ করলে ব্যাঙ মুখে নিয়ে বেরিয়ে যায়। কিন্তু গোখরো সাপকে তো ছেড়ে দেওয়া যায় না। এর দংশনে মৃত্যু অনিবার্য।

ঘুলঘুলির মধ্যে স্বল্প জায়গা। লোকেরা একে একে ওখানে যাচ্ছে আর সাপ দেখে এসে বাইরে জড়ো হচ্ছে। বারান্দা পেরিয়ে বাইরের চাতাল ভরে গেছে। শুনেছি এই চাতালে জমিদারি আমলে গানের আসর বসত। সাপটাকে নিয়ে জল্পনা কল্পনার শেষ নেই। কেউ বলছে সাপটাকে এখনি মেরে ফেলা উচিৎ। আবার কেউ বলছে না না কক্ষনো নয়, ওটা বাস্তু সাপ, জমিদার পরিবারের কত জন্মের সঞ্চিত ধন রক্ষা করার জন্য কোন পূর্বসূরি সাপ হয়ে পুনর্জন্ম নিয়ে পাহারা দিচ্ছে। এই সাপ কাউকে কাটবে না। তবে গচ্ছিত সম্পত্তির ক্ষতি করলে কাউকে ছেড়ে দেবে না। এই সাপ মারলে মহা অকল্যাণ হবে। অবশ্য বেশির ভাগই সাপটাকে মেরে ফেলার পক্ষে।

কিন্তু মারে কে? যেমন অবস্থায় সাপটা আছে তাতে বল্লমের খোঁচাটা ঠিকমত ওর গায়ে বেঁধাতে না পারলে বিপদ নিশ্চিত। কিছুক্ষণ বাদে হন্তদন্ত হয়ে জমিদার পরিবারের ছোটবাবু এলেন। হাতে দোনালা বন্দুক। জমিদারি চলে গেলে ওই পরিবার তথা গ্রামের বিপদকালিন সুরক্ষার এই শেষ অস্ত্রটাকে প্রতিবছর নবীকরণ করান। ছোটবাবু আসতেই লোকজন সরে গিয়ে জায়গা করে দিল। ছোটবাবু তাঁর দুনালা বন্দুক নিয়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন। কেউ বাধা দিল না। ছোটবাবু সাপটাকে মারার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে কথা। পাঞ্জাবীর পকেট থেকে কার্তুজ বের করে বন্দুকে ভরে সিঁড়ির নিচে ঢুকলেন। গড়নে রোগা হলেও ছোটবাবু বেশ লম্বা ছিলেন। তাই সিঁড়ির নিচে সোজা হয়ে দাড়াতে পারছেন না। ভুলু-দা টর্চ-লাইট ধরলেন। বাইরে জনতা কানে আঙুল দিয়ে প্রতীক্ষা করছে। কিন্তু গুলির আওয়াজ আসছে না। একজন এসে বলল, আরে গুলি নিক্ষেপন হচ্ছেনা, বাস্তু-সাপ বলে কথা। কেউ বলল, বন্দুকটা বোধহয় খারাপ হয়ে গেছে। সেই ব্রিটিশ আমলের বন্দুক, আর কি থাকে। কিছুক্ষণ পর চেষ্টার পর ছোটবাবু বেরিয়ে এলেন। বাইরে চাতালে লোকজনকে সরিয়ে দিয়ে আকাশে গুলি নিক্ষেপন করলেন। প্রচন্ড শব্দে বাড়ি কেঁপে উঠল। না, বন্দুকটা তো ঠিক আছে। আবার ভেতরে ঢুকলেন। সাপটাকে আবার গুলির চেষ্টা করলেন। কিন্তু এবারও গুলি নিক্ষেপন হল না। বাইরে এসে তিনি দ্বিতীয়বার গুলি নিক্ষেপন করলেন। আগের বারের মত এবারও বাইরে গুলি নিক্ষেপন হল। আশ্চর্য্য, বাইরে নিক্ষেপন হচ্ছে কিন্তু যখনই সাপটার উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে তখন আর কাজ করছে না। বাইরে নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়ে গেল।

এটা বাস্তুদেবতার সাপ। এ সাপ মারা অত সহজ নয়। বরং দুধকলা দিলে সাপটা তা খেয়ে বেরিয়ে যেত। পুরানো দিনের এমন গল্প ঠাকুমার কাছে অনেক শুনেছি। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা ভাবনা পাল্টেছে। তাই এসব মতামত গুরুত্ব পাচ্ছে না। দেখতে দেখতে তা প্রায় দু-ঘন্টা কেটে গেছে। সাপটা ওখান থেকে নড়ছে না। একই জায়গায় বসে আছ। ক্রমে খবরটা গ্রামে ছড়িয়ে গেল। আরও আরও লোক আসতে থাকল। ভেতরের চাতাল পেরিয়ে বাড়ির সামনেও তিল ধরানোর জাগয়া নেই। ছোটবাবু আসার আগে মন্টু বল্লম আনতে গিয়েছিল। হাতে বল্লম নিয়ে মন্টুকে আসতে দেখে উপস্থিত জনতার মধ্যে একটা চাপা উত্তেজনা দেখা গেল। এবার খেলা দেখা যাবে, গল্পেও ইতি হবে। কিন্তু অস্ত্র তো এল মারে কে! কেউ এগিয়ে আসছে না। পূর্বপুরুষের সম্পত্তি রক্ষার সঙ্কল্পে দায়বদ্ধ এই সাপ, বল্লমের খোঁচা যদি প্রথম আঘাতেই ঠিকমত না লাগে সাপটাও ছেড়ে দেবেনা।

সময় যত পেরুচ্ছে উত্তেজনা আর হতাশা তত বাড়ছে। ভুলুদার হাতের লাইটে তখন টিম টিমে আলো দিচ্ছে। একজনকে নতুন ব্যাটারী আনতে পাঠানো হয়েছে। ভুলুদা লাইটটা আর ধরে রাখতে পারছে না। অন্য একজন টর্চলাইটা ধরল। সাপটাকে মারতে না পেরে ছোটবাবু ওখানে আর দাঁড়ালেন না। হনহন করে ওখান থেকে বেরিয়ে গেলেন। ভিড়ের মধ্যে হঠাৎ রুস্তমকে আসতে দেখে লোকজন মুসকিল আসানের আস্বাস পেল। প্রথমতঃ রুস্তম ধর্মে মুসলিম। শত্রু সাপ নিধনে কোন ধর্মীয় বিধি নিষেধ নেই। অন্যদিকে এ ধরনের মুশকিল আসানে রুস্তমের কোন জুড়ি নেই। জীবনের ঝুঁকি নিয়েও লড়তে পারে সে।

বল্লম নিয়ে রুস্তম এগিয়ে গেল। বল্লমটা মজবুত কিনা একবার দেখে নিল। তিন চার হাত লম্বা এই গোখরো সাপের উপর আঘাত পড়লে বল্লমের লাঠিকে সে পেঁচিয়ে ভেঙে ফেলতে পারে। টর্চ-লাইটে নতুন ব্যাটারী ভরা হল। নূফুলউদ্দিন

লাইট ধরল। নতুন আলোয় সাপটা আরও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে এখন। গলির ভেতরে বাকি সবাইকে সরিয়ে দেওয়া হল। রুস্তম আক্রমণ চালাল। হ্যাঁ প্রথম আঘাতেই সে সাপটাকে বিঁধে ফেলেছে। কিন্তু লড়াই চলছে। সাপটা বল্লমের ডান্ডাটাকে পেঁচিয়ে প্রতি-আক্রমণ করছে। বাইরে সবাই খবরের অপেক্ষায় পেট চেপে বসে আছে। ছপাত্ ছপাত্ শব্দ শোনা যাচ্ছে। আক্রমণ ও প্রতি আক্রমণের শব্দ অনুভব করা যাচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। এ যে কত কষ্টের পাঠকেরা বুঝতে পারছেন। যদি আমার ভাই সঙ্গে না থাকতো ঠিক ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে দেখে নিতাম। কিন্তু বেশিক্ষণ সাপটা লড়তে পারলো না। আস্তে আস্তে নিস্তেজ হয়ে পড়ল। বাস্তু রক্ষার দায়িত্ব আজ শেষ হল।

ঘুলঘুলির বাইরে অনেক লোক অপেক্ষা করছিল। সাপটাকে ঘুলঘুলির বাইয়ে আনা হল। সাপটার দেহটা তখনও অটুট আছে। বল্লমের খোঁচায় কেবল মাথাটা ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। পেটটা বেশ মোটা। এ নিয়েও নানা মন্তব্য শোনা যাচ্ছে। কেউ বলছে আহা রে এটা মা সাপ, পেটে কতই না ডিম আছে। সুরে সুর মিলিয়ে কেউ বলল ভালো হয়েছে এতগুলো গোখরো জন্মালে পাড়া সাবাড় করে দিত। শেষ-দেখা দেখে দূর থেকে প্রণাম জানিয়ে একে একে জনতা প্রস্থান করতে থাকল।

ক্রমে সন্ধ্যে হয়ে আসছে। এখন আর বেশি কেউ নেই ওখানে। আমিও ভাইকে বাড়িতে রেখে এসেছি। ঠিক হল সাপটার হিন্দুমতে সৎকার করা হবে। অর্থাৎ পুড়িয়ে ফেলা হবে। আমিও সৎকারের কাজে যোগ দিলাম। তা প্রায় জনা-কুড়ি হয়ে গেল। ছোটবাবুর পাঁচিলঘেরা বাগানের একদিকে একটা পুকুর আছে। এই পুকুরটায় কেউ স্নান করে না। পুকুরটার পাশ দিয়ে খাল গিয়ে নদীতে মিশেছে। বাগান থেকে কিছু কাঠ সংগ্রহ করা হল। তারপর আগুন জালিয়ে সাপটার শেষকর্ম শুরু হল। কিছুক্ষণের মধ্যে সাপটার পেট থেকে একটা বেড়ালের বাচ্চা বেরিয়ে এল। বাস্তুসাপ আর বেড়াল ছানার অন্ত্যেষ্টি একসাথে শেষ হল। আমরা স্নান করে বাড়ি ফিরলাম। পরে দেখা গেল রাণী বেড়ালের সদ্য জন্মানো চারটে ছানার একটা নিখোঁজ। রাণীকে দেখে বড্ড কষ্ট লাগল। সে ম্যাও ম্যাও করে সারা বাড়িতে খুঁজে বেড়াচ্ছে তার চতুর্থ জনকে। রাণী তখনও জানে না, সে আর নেই।

এলেম নতুন দেশে

মৈত্রেয়ী সাহা

ঝর্ণা, তোমার ধৈর্য্য অপরিসীম। ধৈর্যের অগ্নিপরীক্ষায় তুমি সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছ - শেষ পর্যন্ত আমাকে দিয়ে লিখিয়ে ছাড়লে ।

আমি যে কোনও অর্থেই লেখিকা নই। "বিদেশে নিয়মো নাস্তি" এই গণ্ডীর মধ্যে পড়ে কাগজ-কলম নিয়ে বসেছি। তুমি কত ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করেছ - নানা দেশের কৃষ্টি, নানা ঐতিহ্যের পথে তোমার হয়েছে আনাগোনা। তাই ভাবলাম আমার নতুন দেশে আসার অভিজ্ঞতাটা তোমার সাথে ভাগ করে নেই ।

আকাশপথে যখন দেশের মাটি ছাড়লাম মনে পড়েছিল 'রক্তকরবী'র বিশু পাগলার গানের কথা

"আমার তরী ছিল চেনার কূলে

বাঁধন যে তার গেল খুলে

তারে হাওয়ায় হাওয়ায় নিয়ে গেল কোন অচেনার ধারে"

বাইরের দিকে তাকিয়ে প্রথম অসীমের সাথা হোল কোলাকুলি - "হৃদয় আমার প্রকাশ হল অনন্ত আকাশে"।

তারপর এসে পৌঁছলাম 'নতুন দেশে' "কোন অচেনার ধারে"। ভাবপ্রবণতা গেল পালিয়ে।

আমার জীবনের ২৬ বছর বয়সে এসে পৌঁছলাম মন্ট্রিয়ল শহরে। সেই রাতটা কাটাতে হবে এয়ারপোর্টের হোটেলে। সকাল ন'টায় সাসকাটুনের প্লেন। ভাবলাম যাবার আগে স্নান করে নিই। স্নানের মস্ত বড় ঘর - আর তার চার পাশের দেওয়াল আয়না দিয়ে মোড়া। যেদিকে তাকাই দেখি আমারই মুখ - শুধু আমারই মুখ, শুধু আমারই মুখ। আমার সহস্র মুখ। কি অবাস্তবতা! বুঝেও দারুণ অস্বস্তিতে দৌড়ে বেরিয়ে এলাম।

নতুন দেশে আমার এই প্রথম অভিজ্ঞতা।

ঠিক সময়ে এসে পৌঁছলাম সাসকাটুনে। এয়ার পোর্টে আমার প্রফেসর ডক্টর পেপার ও তার সাথে ছিলেন তোমাদের যদুদা। ডক্টর পেপার এসে পৌঁছে দিলেন বাড়ীতে, যার তিনতলায় ছিল আমাদের বাসস্থান। যাবার আগে ১০০ ডলার দিয়ে বললেন "যাও, কাল তোমরা দুজনে বাইরে গিয়ে একটু এনজয় করে এসো।"

এটাই কি নতুন দেশের আতিথেয়তা? এরকম তো দেখিনি বা শুনিনি কখনও!!!

রাস্তা দিয়ে গাড়ী চলছে - অথচ কোন লোকজন নেই। সুন্দর সারি সারি সব বাড়ী, ম্যানিকিওরড ফুলের বাগান - কি নিস্তব্ধতা। মনে মনে ভাবছি "একেই কি বলে twilight zone?"

তার পর দিন থেকে শুরু হোল ইউনিভার্সিটিতে যাওয়া। বাসের জন্য অপেক্ষা করছি চার মাথার মোড়ে। আমাদের দেখে অজানা, অচেনা লোক গাড়ী থামিয়ে দিয়ে আমাদের তুলে নিয়ে পৌঁছে দিল ইউনিভার্সিটিতে। এই ঘটনা প্রায়ই ঘটত। আমরা তো বিদেশী। নতুন দেশের লোকেরা কি এমনি?

ধীরে ধীরে অবাধ্য শীত এসে শুধু কাঁপনই ধরিয়ে দিল না, দিল নতুন অভিজ্ঞতা, যদিও আমি জন্মেছি শীতের দেশে - শিলং পাহাড়ে। আমলকী বনের কাঁপনের চেয়ে যে এ অনেক অন্য রকম।

বাস থেকে হেঁটে যেতে হোত কেমিস্ট্রী ডিপার্টমেন্টে। যেতে যেতে হয়ে যেতাম ভীষণ তৃষ্ণার্ত। এত ঠান্ডায় তৃষ্ণার্ত হব কেন? আমরা গরমের দেশের মানুষ - গরমে হয়ে যাই তৃষ্ণার্ত। বুঝতে সময় লাগল, -৪০ ডিগ্রী তে এ্যাটমসফিয়ারে ময়সচার কনটেন্ট কত কম। তাই এত তৃষ্ণা। এটাও একটা অভিজ্ঞতা।

কি সৌন্দর্য এই শীতের। মাউন্টেন এ্যাশের গাছে লাল ফলগুলোর ওপর বরফ পরে ঝকঝক করছে, হীরের টুকরোর মতন, আর নীচের দিকে ফলগুলো যেন চুণী দিয়ে গাঁথা। জানালা দিয়ে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে থাকতাম।

একদিন আমাদের প্রিয় দাদা, ডক্টর কানাই লাল মুখার্জী (বেনারসের) দরজায় ভীষণ ভাবে ধাক্কা দিয়ে বললেন "শীগগির দরজা খোল।"। দরজা খুলে দিলে ভেতরে এসে বললেন - "ধুতি-পাঞ্জাবী পরে রবীন্দ্রজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যাব"। রাস্তায় বের হতেই আমাকে দেখে দুটি কুকুর তাড়া করেছে। বেচারা কুকুরও বিদেশীদের তাদের বেশে দেখে নি। "এলেম নতুন দেশে""।

সব অভিজ্ঞতার মাঝে যেটা স্পর্শ করেছিল সব চেয়ে বেশি - পশ্চিম ক্যানাডার লোকেদের আতিথয়তা, আন্তরিকতা ও ভালবাসা। ক্রীসমাসের দিনে আমরা একা বাড়ীতে থাকব এ ছিল তাঁদের কল্পনার অতীত। অধ্যাপকরা ছিলেন আমাদের নিকটভম আত্মীয়। [প্রায় ৫৭ বছর আগের অভিজ্ঞতা]

তবু কেন অলক্ষিত শক্তি টেনে নিয়ে যায় "নিজের দেশের" দিকে? বারে বারে ফিরে যেতে চায় মন সেখানে। তাই সুযোগ পেলেই যাই "পুরোন দেশে" - কলকাতায়।

এবার ২০১৬ সালে যখন গেলাম কলকাতায়, কিন্তু মনে হোল "এলেম নতুন দেশে"। চারদিকে হাই রাইজ, কোন রান্না ঘরে হয় না শুক্তো, মরিচ ঝোল বা ধোঁকার ডালনা। সবাই স্যুপ, প্যাস্টা বা পিটজার অনুরাগী। বাইরের রেস্টুরেন্টে ফিউশন ফুড। সেলাম তোমায় ভজহরি মান্না, তোমার দোকানে গিয়ে পেলাম অপূর্ব ধোঁকার ডালনা , খেয়ে ধন্য হলাম। নতুন প্রজন্ম কথা বলে হিন্দী বা ইংরেজীতে । ক্ষতি নেই তাতে - হিন্দী রাষ্ট্রভাষা, আর ইংরেজী আন্তর্জাতিক ভাষা। শুধু ভয় হয় বাংলাটা না হয়ে যায় এক্সটিংক্ট। তাহলে কোথায় যাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়- শক্তি চট্টোপাধ্যায় বা জয় গোস্বামী? বিবর্তন? হয়তো বা - না, নিশ্চয়ই। আর আমরা বিবর্তনের ঘূর্ণিপাকে তলিয়ে যাওয়া পুরোনো জেনারে শন। দুঃখ করে বলি "পুরানো জানিয়া চেয়ো না আমারে আধেক আঁখির কোণে "।

বিবর্তন যে নানা দিকে। রবীন্দ্রসঙ্গীতে ফিউশন, যদিও কবি বলেছিলেন (পঙ্কজ মল্লিককে) "আমার গানের ওপর স্টীম রোলার চালিয়ো না"। মেলডির বদলে রকিং, গ্লোবাল ফিউশনের ধাক্কায় আসল রূপ লজ্জা পেয়ে লুকিয়ে র ইল আধুনিকতার আড়ালে । হয়তো এটাই নিয়ম। একদিন আমাদের শর্মিলা বলেছিল "রবিঠাকুরের গানের সুর যদি বদললাতে চাও, তাহলে নিজেরা লিরিক লিখে সুর দাও।" কথাটা লেগেছিল ভাল ।

তারপর? যেটার সাথে কিছুতেই কম্প্রোমাইজ করতে পারলাম না বা যেটা র‍্যা শনালাইজ করতে পারলাম না সেটা হোল যখন দেখলাম ২৪/২৫ বছরের মেয়েরা হাওড়া স্টেশনে শর্টস পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে । জবাব নেই। জয় হোক তোমাদের। জয় হোক তোমাদের বিবর্তনের । এ দেশ *আমার* কলকাতা নয়। মনে হোল আবার "এলেম নতুন দেশে"। ৬০ বছর আগের কলকাতা ছিল আমার দেশ।

ঝর্ণা, যদি সমালোচনার সম্মুখীন হও, তবে সম্পাদিকা হিসাবে সেটা তোমার দায়। ভাবনাটা আমার, মূল্যটা তোমার।

পিপীলিকা

বেণু নন্দী

জবরদস্ত তাগাদা এসেছে শারদীয়া লিপিকার পূজাসংখ্যায় লেখা দিতে। কিন্তু কি লিখব? লেখার সব বিষয় ফুরিয়ে গেছে যে! এ বছর যেন লেখার সব বিষয় গুলিয়ে যাচ্ছে।

দলে দলে পিঁপড়ে বাইরে থেকে লিভিংরুমটায় এসে জড়ো হচ্ছে - কে যেন আমায় বলেছিল পিঁপড়ে দেখলেই তার গায়ে উইন্ডেক্স ছিটিয়ে দিলে তৎক্ষণাৎ পিঁপড়ে মরে যাবে। দেখলাম সত্যিই তাই। এভাবে তো পিঁপড়ে মারা গেল - কিন্তু নিজের মনের মধ্যে কি যেন খচখচ করতে লাগল - এতগুলো প্রাণীহত্যা করলাম? না হয় ওরা লিভিংরুমে ঘুরেই বেড়াতো! বাইরের ডেকটার সিঁড়িগুলো নেবে গিয়েই ওখানটায় পিঁপড়ের একটা ঢিপি রয়েছে বহুদিন সেখান থেকেই সেগুলো বেরুচ্ছে আর আমার লিভিংরুমটায় জড়ো হচ্ছে। তোমরা আমাকে একটু পরামর্শ দাও তো কি করা যায়? কথায় আছে "পিপীলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে"। সত্যিই কি তাই?

----- XX -----

গতি আর বেগতি গল্পের সংকলন

আদিত্য চক্রবর্ত্তী

সারা পৃথিবীটাই কেমন যেন ছড়িয়ে পড়েছে। স্বামী চীনদেশে তো স্ত্রী ব্রাজিলে। এক ছেলে হনলুলুতে আছে তো অন্য ছেলে জেলে। এক মেয়ে কন্যাকুমারী তো আরেক মেয়ে রান্নাঘরে। কি ঝামেলা কাউকেই একসঙ্গে পাওয়া যায় না কখনও। বাবা-মাদের কথা আর নাই বা বললাম - দুই সেট মা-বাবা কতদিকে যে ছড়িয়ে আছেন - কে জানে! এই ছাড়াছাড়ির - যুগে কে যে কার তা বুঝতেও সময় লাগে।

যাই হোক -- এই ছড়িয়ে-ছিটিয়ের জগতে - আমার এই কথার তালগোলে সব যে গন্ডগোল হয়ে যাবে - সেটা তো বোঝাই যাচ্ছে। এরই মধ্যে আপনি যেমন টেররিজম্ এর লোমহর্ষক ঘটনা পাবেন - আবার হাতে গড়া রুটি না খাবার দরুণ নির্মম পরিণতির আভাসও পাবেন। অতএব আমার সঙ্গে থাকুন কিছুক্ষণ।

দাঁত দিয়েই শুরু করা যাক। সেই এক ভদ্রলোক দাঁতের ডাক্তারের কাছে গিয়েছেন কাঁদতে কাঁদতে - দাঁতে প্রচন্ড ব্যথা - খাওয়া ঘুম সব বাদ। ডাক্তার দেখে টেখে বললেন - আপনার চারটে দাঁত তো একেবারে গুঁড়ো হয়ে গিয়েছে। কি করে করলেন এই অসাধারণ কাজ? ভদ্রলোক কেঁদে বললেন - আজ্ঞে ডাক্তারমশাই, আমার বউ বাড়িতে রুটি বানিয়েছিল। সেটা প্রচন্ড শক্ত। সেটা খেতে গিয়েই তো এই অবস্থা। তবে তো সে ক্ষেত্রে আপনার সে রুটি খাওয়াই উচিৎ হয়নি। খাবেন না বললেন না কেন আপনার স্ত্রীকে? বলে ডাক্তারবাবুটি যেন একটু হাসলেন। তাই তো বলেছিলাম ডাক্তারবাবু আর তারই এই পরিণতি। একেবারে হামান-দিস্তে দিয়ে------- । আর এতক্ষণেই ডাক্তারবাবুর হাসির হদিস মিলল।

বউ যদি সাংঘাতিক হয়, দাঁত তো গুঁড়ো হতেই পারে। দেখলেন তো রুটি না খাওয়ার ফল। এর জের টেনে প্রাণ যাওয়াও মোটেই আশ্চর্য্যের কথা নয়। সেই ঘটনাও বলে ফেলি তাহলে। এই ঘটনা শুনে ভেবে দেখুন আবার - বিয়ে না করে থাকলে বিয়ে করবেন কিনা - আর করে থাকলে যঃ পলায়তি করবেন নাকি। ভুরু কুঁচকে ভালোভাবেই চিন্তা করুন - মারাত্মক ব্যাপার-স্যাপার!

একদিন সকাল বেলায় থানার দারোগাসাহেব ফোন পেলেন। ওপাশে খুবই উত্তেজিত সিপাহী মশাই। হুজুর, মারাত্মক ঘটনা হুজুর, আমি যে পাড়ায় টহল দিচ্ছি সেখানে একজন বউ তার স্বামীকে গুলি করে খুন করেছে। দারোগাসাহেব শান্ত গলায় বললেন - তাহলে তুমি সেই খুনী ভদ্রমহিলাকে হাতকড়া পরিয়েছ তো? কেন খুন করেছে জান? - না হুজুর হাতকড়া পরাতে আমি পারবনা। মহিলাটি ঘর মোছার পর ওনার স্বামী জুতো পায়ে দিয়ে ভেজা মেঝেতে হেঁটে হেঁটে বাথরুম থেকে বেরিয়েছিলেন - আর ব্যাস - ধাঁ করে গুলি চালিয়েছে গিন্নি। তা তুমি খুনীকে গ্রেফতার করছ না কেন? জবাব শুনে অতিশয় চমৎকৃত দারোগাসাহেব - না হুজুর কাছে গিয়ে হাতকড়া পরাতে পারবনা - ঘরের মেঝে এখনও শুকোয়নি। তারপর কি হলো তা অবশ্য জানা নেই।

এতক্ষণ তো এদিক-ওদিক করেই কাটল। এইবার আসা যাক্ সেই লোমহর্ষক টেররিস্টের কান্ডকারখানাতে - যা কিনা একেবারে আমার এই চক্ষুযুগলের সামনেই ঘটে গেল। কাউকেই বলিনি এতদিন - কে জানে কার মনে কি আছে? এই সেদিন সকালবেলায় সূর্য্যদেব সবেমাত্র আড়মোড়া দিয়ে ঘুম থেকে উঠেছেন কি উঠবো উঠবো করছেন। আমি সবে নিতান্ত অনিচ্ছায় নদীর ধারে গিয়েছি প্রাতঃভ্রমণের উদ্দেশ্যে। গিয়ে দেখি সেখানে সেদিন আবার এক চ্যারিটি পিকনিক

ও হচ্ছে। তবু ভালো কিছু খাওয়া-দাওয়া জুটবে। আর কে না জানে খাওয়ার নামেই আমার মন কত খুশী হয়। এই একটা ব্যাপারে আমার কোন আলস্য নেই - নারাজকতা নেই- বরঞ্চ খুবই আগ্রহ। চক্রবর্ত্তীদের সবই খুব ভালো বাদে এই পেটুকত্ব।

দেখেছেন তো - আমার এই টেররিজম এর গল্প বলতে গিয়ে খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপার চলে এলেই বিপদ - বিরাট চক্রান্ত! আমার গুরু শিবরাম চকরবরতীর ভাইকে গোল্লায় পাঠাবার গল্প নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের। না মনে থাকলে বলবেন - কোন এক দিন সেটার ব্যাখ্যান করা যাবে না হয়। যাক্ ফিরে আসি সেই টেররিজমের ঘটনায়!

সেই কাকডাকা সকালে নদীর ধারে পার্কে গিয়ে দেখি হইহই ব্যাপার। এক সিপাহীজী এক ছোটখাটো ভদ্রমহিলার সঙ্গে প্রচন্ড বচসায় রত। কি হলো দারোগাসাহেব - জিজ্ঞেস করলাম। সেই ভদ্রমহিলা গাড়ি চালাচ্ছিলেন। ড্রাইভারের সিটে আবার পেল্লায় উঁচু এক বালিশ। দেখলাম দারোগাসাহেব বলাতে সেই সিপাহীজী আমার প্রতি বেশ সদয়। হাসি হাসি মুখ। আওর কহিবেন না হুজুর - এহী দেবীজী - গাড়ি চালাতা হ্যায় - আওর যাঁহাসে লোকজন পয়দল যাতা হ্যায় - উঁহা পর এহী পিল্লায় মোটরবা কো চঢ়াই দিয়া। দেখিয়ে কিয়া আক্কেল হ্যায়! হমকো লগতা হ্যায় এ দেবীজী চক্রান্তকারী গিরহ কা পুতলীবাই হ্যায়। পগদন্ডীপর চলনেবালোঁ কো দবাকে কুচলনেকা মতলব কিয়া হ্যায়। হম ইসকো হথকড়ী পহনাকে থানামে লে জায়েগা- থানেদার জরুর বহুত খুশ হোকর হমকো সিপাহী সে কনিসটিবল্ বনা দেগা। এই সব যখন খুব জোরে জোরে সিপাহী বলছে তার মধ্যে আমাদের দেবীজী বলার চেষ্টা করলেন - আমি তো এসব কান্ড করনে নেহী আয়া। আমার তো ওই সব টেররিজমের কথা ভাবলেই আক্কেল গুড়ুম হো যাতা হ্যায়। হম তো - হম তো ইধর আতা পিকনিক্ মে ইডলী খানে কো! কিঁউ ঝামেলা করতা হ্যায় সিপাহী সাহেব!

এই কথা শুনেই তো আমাদের 'দারোগা সাহেব' তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল। দেখা - দেখা- হমকো ফির সিপাহী বোলতা। আউর তুম কি করকে পুরা ইটালী দেশ কে খা যায়গা? তুম তো সচমুচ্ বহুত বড়া চক্রান্তকারী হ্যায়। তুমকো পকড়ে গা তো হম জরুর দারোগা বন্ যায়গা। বলে আমার দিকে হাসিমুখে বিজয়গর্বে তাকাল। শুনে তো আমি তাজ্জব। আর দেবীজী তখনও বলবার চেষ্টা করছে - এখন কি করি বলুন তো - এই বেপথ থেকে ঠিক পথে গাড়ী কে নিই কি ভাবে - এই সরু রাস্তায় reverse করা তো মুশকিল। আমি তো কিংকর্তব্যবিমূঢ় - আরে আগে তো এই আসন্ন হাতকড়া থেকে রক্ষা পান, তারপর অন্য কথা। আমি দারোগা সাহেবকে বললাম - আরে আরে দারোগাজী - এ মেমসাব ইটালীকো নহী খানা চাহতী - এ তো ইডলী খানেকে লিয়ে ইধর আয়ী হ্যায়। -- ওহ অব সমঝা - এ মেমসাব চক্রান্তকারী নহী হ্যায় - মগর পেটপূজা করনে কে লিয়ে - ইডলী খানে কে লিয়ে ইধর আয়া হ্যায় আউর গাড়ী উল্টা চলাকে খামোখা হমকো মুসিবতমে ডালা। আগে হমারা পরমোশন ভী গয়া। পুরা সুব ই হমারা বরবাদ হো গয়া। বলে সিপাহীজী খৈনি পিষতে পিষতে, রামা হো, রামা হো করে চলে গেল। আর 'চক্রান্তকারী' মেমসাহেবের গাড়ী স্বপথে নিয়ে আসার পর মেমসাহেব বললেন- বাব্বা কি ঝামেলাতেই না পড়া গিয়েছিল। আর আমি যেন শুনলাম উনি খুশী হয়ে বলছেন - আসিস আমার বাড়ী, ইলিশ মাছ খাওয়াব। এখনও জানিনা সেটা ঠিক শুনেছিলাম না আমার পেটুক মনের ভ্রান্তিবিলাস।

আমার কাছে শিবরাম চক্রবর্ত্তী একজন উঁচুদরের কথা এবং শব্দের খেলোয়াড়। সেই মই নিয়ে হইচই, ইতু থেকে ইত্যাদি, মক্তারামবাবু স্ট্রীটের মুক্ত আরামের অদ্ভুত শব্দ নিয়ে খেলা - না পড়লে বিশ্বাস করা যায় না।

একদিন শিবরাম চক্রবর্ত্তীকে গামছা পড়ে কুয়ো থেকে জল তুলতে দেখে এক ভদ্রমহিলা ওঁকে বললেন যে আপনি এত বড় বংশের ছেলে, আপনার বাবা এত নামী মানুষ আর এইভাবে গামছা পড়ে জল তুলছেন - আশ্চর্য! শিব্রাম বললেন - আপনি আমার বংশ, বাবা এমনকি গামছা তুলে কথা বলছেন - আশ্চর্য!

সাহিত্যিক এর কথায় মনে পড়ল বোধহয় - নাকি কোথাও পড়েছি এই ঘটনা সৈয়দ মুজতবা আলিকে নিয়ে। একবার আলি সাহেব একটা মনোহারী দোকানে গিয়ে জানতে চাইলেন তাদের কাছে ডায়মন্ড বল পয়েন্ট পেন আছে কিনা। -- তাতে দোকানদার বলল - না, নেই। সেটা শুনে মুজতবা আলী বললেন - দেখ, তুমি মোটেই ভাল সেলসম্যান নও। তোমার ক্রেতাকে এভাবে ফিরিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তোমার বলা উচিৎ ছিল ডায়মন্ড নেই তবে অন্য পেন আছে যেমন পাওয়ার, ব্রাইট, পারকার, সুলেখা ইত্যাদি ইত্যাদি। দোকানদারের এটা পছন্দ হলোনা তবে এর থেকে একটু শিখল বোধহয়। এবং কিছুক্ষণ পরে আরেক জন ক্রেতা এসে জানতে চাইল টয়লেট পেপার আছে কিনা। সরাসরি না বলে দোকানদার বলল - টয়লেট পেপার নেই - এই একটু আগে শেষ হয়ে গেছে। তবে আমার দোকানে শিরীষ কাগজ আছে - তাই দেব কি?

একবার এক ভদ্রমহিলা প্লেনে করে ভারত থেকে ক্যানাডায় আসছে। ক্যানাডায় নেবে স্বামীকে বিরাট আশ্চর্য নিয়ে বলল - জানো - যখন ৩৫ হাজার ফিট দিয়ে প্লেনটা আসছিল চাঁদটা কে না কি ভীষন বড় লাগছিল। কেন বলোতো বলে স্বামীর দিকে তাকাল। স্বামী চুপচাপই ছিল। তখন ভদ্রমহিলা বলল - জানি তুমি বলতে পারবে না। আমি জানি। আসলে আমরা তো চাঁদের অনেক কাছে চলে এসেছিলাম তো তাই, তাই না?

আরেকটা ঝাড়া গল্প না হয় বলা যাক্। সবই যখন এখান থেকে, ওখান থেকে যোগাড় করা।

এক খুবই বয়স্ক ভদ্রলোক - প্রায় মারা যেতে বসেছেন। তিনি তাঁর একমাত্র ছেলেকে ডেকে বললেন - হ্যাঁরে হরেন - যা তো আমাকে একজন সংস্কৃত মাষ্টারমশাই ঠিক করে দেতো। হরেন আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো - কিন্তু বাবা, এই বয়সে তুমি এখন সংস্কৃত শিখবে? সেটা কেমন হবে? তাতে বাবা মৃদু হেসে বললেন - জানি আমি মারা গিয়ে তো স্বর্গে যাব - আর সেখানে দেবদেবীরা থাকবেন - তাঁরা তো আর আমাদের মতন বাংলা অথবা হিন্দী বলেন না - দেবভাষা তো সংস্কৃত। ওঁদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে তো আমাকে দেবভাষা সংস্কৃত জানতে হবে!

আবার শিব্রাম আর বিষয় এবার ছোটগল্প প্রতিযোগিতা। জয়ী কে হলো আপনারাই বুঝে নিন।

কানাই এবং বলাই - রাম লক্ষ্মণ দুভাই। কানাই বিয়ে করলো। তখন বলাই বাহুল্য।

এই লেখাটিতে কিছু গল্প আমার নিজের এবং কিছু সংগৃহীত। তবে এর গতি, আকৃতি, প্রকৃতি নিজেদের ইচ্ছেমত পাল্টে নিতে পারেন।

নাগকেশরের ফুল আর একটি টিয়া

সুভাষ চন্দ্র বিশ্বাস

জানালা খুলেই চোখে পড়ে

নাগকেশরের ফুল আর একটি টিয়া।

ঘন সবুজ রঙ রক্তরাঙ্গা ঠোঁট,

অদ্ভুত বিস্ময়ে স্থির চোখ আর নাগকেশরের ফুল।
আকাশের নীল হতে অঝোরে ঝরে আবেগ বৃষ্টি,
প্রেমপাশে বাঁধা পড়ে লাল ঠোঁট আর নাগিনী ফুল।
আমার মনের জানালা খুলে গেল।
শরীরের ছোঁয়ায় কম্পন জাগে,
বীতকাম সাধুর মনও বিচলিত মেনকার মোহে।
প্রেমের সঙ্কেতে হৃদয়ে আলোড়ন,
পৃথিবীর বুক জুড়ে বিস্তারিত এক মহাকাব্য।
মনের গভীরে কোন এক গোপন কোণে
আর এক প্রেম নির্বাক নিষ্কাম তমসায় নিমগ্ন।
বহুরূপী প্রেম দেখেছি শহরের আনাচে কানাচে,
রাজপ্রাসাদে, হেমন্তে বসন্তে আর গানে গানে।
অনেক ঘুরেছি আমি মানুষের ভীড়ে,
থমকে দাঁড়িয়েছি এসে খাজুরাহের মন্দিরে।
কামুক প্রেমের ব্যঞ্জনা মূর্ত হ'য়ে আছে মন্দির গাত্রে।
ভাষ্কর্যের কারুকার্য্যে অঙ্গভঙ্গিমায় নৃত্যের ছন্দ।
হাজার দৃষ্টি লেহন করে হাজার বছর ধরে।
শ্লীলতার সীমারেখা পেরিয়ে আজও দাঁড়িয়ে উদাসীন।
নিষ্কাম মন সবার ঊর্দ্ধে ওঠে অনায়াসে,
ঈশ্বর সাধনায় সে প্রেম স্বর্গীয় সুন্দর।
টিয়াটি এখনও তাকিয়ে আছে
নাগকেশরের ফুলের দিকে,
যেন এক অস্ফুট প্রেম বিমূর্ত সবুজের পটে।
আমার মনে জাগে আর এক আবেগ।
ফুলে ভরা সকাল আর সোনালী রোদে।
অজানা সুরের আকর্ষণে অলস মেঘের মুগ্ধ প্রেমে
এক অমোঘ বন্ধনে বন্দী আমি।

রোদচশমা

অমর কুমার

আংশিক সত্য ঘটনার সঙ্গে কল্পনার কিছুটা রঙ মেশানো এই গল্পের নাম দিলাম রোদচশমা । রোদচশমা আমার মতো অনেকেই ব্যবহার করেন, পছন্দ করেন যদিও সেটা সানগ্লাস নামেই বহুল পরিচিত । কেউ কেউ কালোচশমা বলতে ভালবাসেন, রোদচশমা শব্দটা প্রায় শোনাই যায় না । না, আমি রোদচশমার আত্মকাহিনী লিখতে বা গুণাবলী আলোচনা করছি না। ইসকুলের কোন উঁচু ক্লাসের জন্য পরীক্ষাতে রোদচশমার আত্মকাহিনী লিখতে বললে আকর্ষণীয় কিছু তথ্য বা ঘটনা জানা যেতেই পারে। আমার গল্পের প্রধান চরিত্রে যিনি আছেন তাঁকে সবসময়ই রোদচশমা পড়ে থাকতে দেখা যেত, তাই তাঁর নাম হয়ে গিয়েছিল রোদচশমাবাবু। পোশাকি নাম ছিল অবশ্যই একটা, সেটা ছিল হিরণ্ময় দত্ত। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, সৌম্য সুন্দর সুঠাম চেহারার মানুষটির মাথা-ভরতি সাদা চুল, ধোপ-দুরস্ত বেশবাস-সব মিলিয়ে নজরটানা ব্যক্তিত্ব। অনুমানে তখন বয়স ছিল সত্তর ঊর্ধ্বে । কৈশোর যৌবনে খেলাধুলো শরীরচর্চা যোগাভ্যাস ভালই করতেন বেশ বোঝা যায়।

রোদচশমাবাবুর সঙ্গে আমার কোথায় কিভাবে চেনা জানা ও পরিচয় ঘটেছিল সেই কথায় এবার আসি । ইদানীংকালে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বেশকিছু বৃদ্ধাশ্রম গজিয়ে উঠেছে বা উঠছে । হবে নাই বা না কেন, যে ভাবে মানুষের সংখ্যা ও আয়ু বাড়ছে, বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের সংখ্যা সেই অনুপাতে বেড়েই চলছে। অন্য দিকে সময়ের সঙ্গে দ্রুততালে সামাজিক কাঠামো, সংসার, পরিবার, সম্পর্ক সবেরই আমূল পরিবর্তন হয়ে চলেছে সর্বত্রই। আধুনিকতার চাপে এই বৃদ্ধ বৃদ্ধারা যেন একটা সামাজিক সাংসারিক বোঝা হয়ে যাচ্ছেন ও চেনা জানা পরিচিত ভালবাসার জগতটার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছেন না। অন্য দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখলে, ইহলোক-বাস আর পরলোক-বাসের মাঝখানে আলাদা একটা জগতের প্রয়োজনে বৃদ্ধাশ্রমগুলি যেন পান্থনিবাস, শান্তির জন্য নিরিবিলি বিশ্রামের জায়গা । পথিক যেমন অনেকটা পথ রৌদ্র মাথায় হেঁটে ক্লান্ত হয়ে জিরিয়ে নেয় গাছের ছায়ায়, অনেকটা সেইরকম। আবার চলতে চলতে পথিকের পিছন ফিরে চেয়ে দেখার ব্যাপারটা যেমন- কিছুটা সেইরকম। গাছ গাছালি ঘেরা জলাশয়ের ধারে ছোট ছোট এই বৃদ্ধাশ্রমগুলির নাম গুলি বেশ আকর্ষণীয় লাগে আমার কাছে, কয়েকটি যেমন - শেষের কবিতা, গোধূলি, শান্তিনিকেতন, আনন্দ আশ্রম, দিনান্তে। নামগুলি বেশ কাব্যিক, মানানসই ও যথাযথ অর্থপূর্ণ।

রোদচশমাবাবুর দেখা পেয়ে ছিলাম প্রথম 'শেষের কবিতা' বৃদ্ধাশ্রমে যেখানে আমার মেজজেঠুকে বেশ কিছুদিন থাকতে হয়েছিল। জেঠিমা আগেই গত হয়েছিলেন। নিঃসন্তান জেঠুকে দেখাশোনার কেউ ছিল না। তখন পড়াশোনা শেষ করে চাকরীতে নতুন জীবন শুরু করেছি। শনিবার অফিসের পর জেঠুর সঙ্গে দেখা করতে পৌঁছুলাম শেষের কবিতায়। গেট পেরিয়ে বেশ কিছুটা যাবার পরে কানে এলো একটা পুরুষালি সুরেলা কণ্ঠ । আরো কিছুটা এগোতেই একটা খোলা জায়গায় পলাশ, কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়া গাছের বাহার। দূর থেকে যার উপর চোখ পড়লো তাঁকে তিন দিক ঘিরে রয়েছেন জনা ২০-২৫ আশ্রমবাসী যার মধ্যে মহিলারাই বেশি। কালো মোটা ফ্রেমের রোদচশমা তাঁর চোখে যদিও সূর্যের আলো অনেকটা ম্লান। আর কারো চোখে রোদচশমা ছিল না, না থাকারই কথা। দাড়ি গোঁফ কামানো ফরসা মুখে সাদা চুলের আবরণে সেই সুদর্শন সুপুরুষটির পরনে ছিল সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি, চোখ দুটি ছিল ঢাকা কালো রোদচশমায় ।

অস্তগামী সূর্যের শেষ আলো পড়েছিল তাঁর মুখের এক পাশে। সময়, পরিবেশ ব্যক্তিত্ব আর রোদচশার সমন্বয়ে মানুষটিকে বেশ রহস্যময় ও আকর্ষণীয় লেগেছিল আমার ঐ মুহূর্তে। তিনিই গাইছিলেন খোলা ভরাট গলায়

'জীবন যখন শুকায়ে যায়, করুণা ধারায় এসো .....'।

একটা শেষ হতেই সবার পেড়াপেড়ীতে আরও একটা গান করলেন তিনি

'চরণ ধরিতে দিওগো আমারে, নিও না নিও না সরায়ে'.....

কবিগুরুর হৃদয় ছোঁয়া সুগভীর গানের কথা, গোধূলি ক্ষণ, বার্ধক্যের চৌকাঠে পৌঁছানো সমবেত আশ্রমবাসী ও রোদচশমাবাবুর সাবলীল পরিবেশনা। মন্ত্রমুগ্ধের মতো গান শুনলাম ও আরো কতক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলাম জানিনা। আজ বহু বছর পরেও সেই অদ্ভুত সুন্দর মায়াবী ছবিটা এখনও ভুলতে পারিনি। আমার জেঠুও ঐ শ্রোত্রীবৃন্দের মধ্যে একজন ছিলেন। পরে জেঠুর কাছে অনেক কিছু জানতে পারি ঐ মানুষটির বিষয়ে। শেষের কবিতার অতিথিদের মধ্যে অন্যতম হিরণ্ময় দত্ত, অনেক গুণ ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ, দর্শন শাস্ত্রে ডক্টরেট ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নামী অধ্যাপক ছিলেন। অবসর নিয়েছেন বেশ কয়েক বছর হল । কয়েকটি দেশী বিদেশী ভাষায় রপ্ত, গান বাজনা সাহিত্য শিল্পে যথেষ্ট পারদর্শী। অনেক দেশ বিদেশ ঘুরেছেন, প্রায় সব বিষয়েই উৎসাহ নিয়ে আলোচনা করতে পারেন । খুব মোহিত হয়েছিলাম সেদিন জেঠুর কাছ থেকে ভদ্রলোকের কথা শুনে, অনেকটা সম্মোহিত বলাই যেতে পারে। এত রকমের গুণ সম্পন্ন ব্যক্তিত্ব এইরকম আশ্রমবাসী হয়ে দিন কাটাচ্ছেন দেখে অবাকই লেগেছিল । আজ মনে হয় তেমনটা মনে করার কোন কারণই নেই। অন্যান্য আশ্রমবাসীদের তুলনায় ওঁকে একটু বেমানান মনে হয়েছিল, বিশেষ করে বয়স ও চেহারার মাপকাঠিতে।

পরের বার জেঠুকে দেখতে গেলাম বাইরে ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে টিপ টাপ বৃষটি পড়ছিল সেদিন। শেষের কবিতার হল ঘরে সবাইকে বেশ আড্ডার মজলিসে দেখা গেল। অবশ্যই সেই হিরণ্ময় দত্তকে দেখলাম আড্ডার মধ্যমণি হিসাবে।ওনাকে ঘিরেই যেন সব কিছু। হলের মধ্যে হলেও ওনার চোখের উপর রোদচশমা সবসময়ই দেখলাম । বাইরেও পড়ন্ত ক্ষীণ আলো, কিছুটা আশ্চর্যই লেগেছিল। পিছনের চেয়ারে বসে লক্ষ্য করছিলাম ঐ ব্যক্তিত্বকে। কিছুক্ষণ চা-টা পর্বের আড্ডার পর দেখলাম সবার অনুরোধে পর পর দুটি কবিতা আবৃত্তি করলেন।একটা বিশ্বকবির লেখা, 'রুদ্র, তোমার দারুণ দীপ্তি ...', অন্যটি প্রমথনাথ বিশীর 'পৃথিবীর প্রতি সমুদ্র'। এককথায় অপূর্ব লেগেছিল ওনার আবৃত্তি। নিঃসন্দেহে স্টাইল, delivery, voice and articulation ওদিন আমাকে খুবই মুগ্ধ করেছিল। জেঠুর সঙ্গে দেখা করে বাড়ী ফেরার সময় বুঝতে পারছিলাম ঐ ভদ্রলোকের প্রতি চুম্বকের মতন একটা আকর্ষণ Grow করছে মনের মধ্যে। হয়তো বা সেই কারণে পরের কয়েকবার বেশ ঘন ঘন শেষের কবিতায় চলে গিয়েছিলাম । জেঠুর প্রতি দায়িত্বর থেকে ওনার আকর্ষণটাই হয়তো বেশী করে টানতো। অনেক সময় দেখতাম বই হাতে গাছের নীচে, কখনও জলের ধারে চিন্তামগ্ন, আবার সবাইকে নিয়ে হৈ চৈ করছেন বা আশ্রমের কাজে মেতে আছেন। যেটা আমাকে অবাক করতো সেটা হল ঐ রোদচশমা চোখের উপর সবসময় যেটা ওনার ব্যক্তিত্বকে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিত। একদিন কৌতূহল দমন করতে না পেরে ওনার প্রসঙ্গেই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কয়েক জনের উপস্থিতিতেই জেঠুকে প্রশ্ন করে বসলাম-

'আচ্ছা জেঠু, উনি সবসময় রোদচশমা ব্যবহার কেন করেন' ?

কয়েকজন মুখ চাওয়া চাওয়ি করলেন, মুচকি হাসলেন কেউ কেউ, এদিক ওদিকে চোখ রাখলেন, কিন্তু সদুত্তর পেলাম না । মনে হল ওনাদের সবার মনেও একই অদম্য কৌতূহল। একটা জিজ্ঞাসার ছাপ যেন ওনাদের চোখে মুখে ঝুলে আছে । কেউ একজন হালকা মন্তব্য কাটলেন, 'হয়তো ওটা পরেই উনি ঘুমিয়ে পড়েন'। দিব্যেনদু কাকু বললেন, 'সত্যি রোদচশমা ছাড়া হিরণ্ময়বাবুকে কখনই দেখা যায় না', ব্যাপারটা কি'? রতনকাকু মনে পড়িয়ে দিলেন, 'কয়েকমাস

আগে উনি নাকি রোদচশমা পরেই পুকুরে দিব্যি সাঁতার কেটেছিলেন'। এক পাশে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন প্রণববাবু, সবাইকে থামিয়ে শুনিয়ে দিলেন ,'কেন নৈশভোজের সময়ওতো উনার চোখে কালোচশমাটি থাকে। 'মাছের কাঁটা বাছেন কি ভাবে রোদচশমা চোখে ?'- কেউ টিপ্পনী কাটলেন। এই রকম আলোচনার মাঝে এসে দাঁড়ালেন পুলকজেঠু। 'একটা জিনিষ বুঝতে পারিনা, উনি তো বই পত্র পত্রিকা খুব পড়েন। কালোচশমায় অসুবিধা হয় না'? রজতবাবু মিহি গলায় বলে উঠলেন, 'তা জানিনা। তবে একবার মাস ছয়েক আগে রোদচশমাবাবুকে রহস্যর কিনারা খুঁজতে প্রশ্ন করা হয়েছিল। উনি সরাসরি হাঁ বা না উত্তর না দিয়ে মন-চোখ-আত্মা-গীতা-অন্তর্দৃষ্টি-বহির্দৃষ্টি নিয়ে গভীর দর্শনী দৃষ্টিভঙ্গির সূক্ষ্ম বিশ্লেষণে প্রায় ঘণ্টা খানেক বকক্তিতা দিয়েছিলেন। সেসব গভীর তত্যকথা আশ্রমবাসীদর মাথায় কিছুই ঢোকেনি ভস্যে ঘি ঢালার মত। সার কথায়, হিরণ্ময়বাবু প্রকারনতরে বুঝিয়ে ছিলেন যে রোদচশমার বাপারটা ওনার ব্যকতিগত ব্যাপার, কারুর মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।' এই প্রসঙ্গে আরো মন্তব্য ও অভিজ্ঞতার কথা বলার জন্য মুখ খোলার আগেই আমার জেঠু প্রাঞ্জল করে বোঝালেন রোদচশমার রহস্য উদঘাটনের চেষ্টাতে কোন ফল হয় নি। কাজলীমাসি বলে উঠলেন- 'বোধ হয়, হিরণ্ময়বাবু রোদচশমা চোখেই জন্মে ছিলেন'। হো- হো, হি- হির একটা হাসির ফোয়ারা ছুটলো এদিক থেকে ওদিক। কৌতুহলী আশ্রমবাসীরা উপভোগ করলেন অনেকেই। সান্ধ্যভোজের ঘণ্টা বাজতেই সবাই চলে গেলেন। আমিও বিদায় নিলাম রোদচশমার রহস্যের কথা ভাবতে ভাবতে।

বছর কয়েক এই ভাবে কাটলো। রোদচশমাবাবুর সঙ্গে সাক্ষাত আলাপ পরিচয় হয়েছে জেঠুর মাধ্যমে। সাহস হয়নি রোদচশমার রহস্যের কথা জানতে। তবে সবসময়ই ওনার কথাবার্তা, সান্নিধ্য উপভোগ করেছি। প্রকৃতই ওনার জ্ঞান বুদ্ধি বিশ্লেষণ তর্ক-বিতর্ক পরিবেশন ক্ষমতা যে কোন বিষয়ে যথেষ্ট উচ্চ মানের। এরপর বছর দুয়েক অফিসের কাজে ইউরোপের কয়েকটা শহরে ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে কেটে গেল।ফিরে এসেও জেঠু ও শেষের কবিতার সঙ্গে যোগাযোগ প্রায় বিচ্ছিন্ন । যাব যাব করেও মাস ছয় কেটে গেল। জেঠুর সাথে টেলিফোনে কথা হয়। শুনেছিলাম রোদচশমাবাবুর শরীরটা ভাল যায় না, প্রায়শই অসুস্থ থাকেন তবে চশমা রহস্যের কোন কূল কিনারা হয় নি। শেষের কবিতারও কিছু প্রশাসনিক পরিবর্তন হয়েছে, কিছু নতুন অতিথির সমাগম হয়েছে।

রথযাত্রার দিন ছিল, পুণ্য দিন ভেবে মনস্থির করে সস্ত্রীক 'শেষের কবিতায়' চলে গেলাম জেঠু ও সবার সঙ্গে দেখা করতে। বিশেষ করে ঐ মানুষটিই টানছিলেন, দেখা হয় নি কতদিন। এরমধ্যে মানসীর সঙ্গে আমার গাঁটছড়া বাঁধা হয়েছে আর হয়তো সেই সুবাদে চাকরীতেও বড়রকম পদোন্নতি হয়েছে । মানসীর কাছে সব গল্প আগেই করা ছিল, ওর ইচ্ছা ও পেড়াপেড়ীতে সাদা-লালের তাজা গোলাপের স্তবক একটি রোদচশমাবাবুর জন্য নেওয়া হল। মেন গেট দিয়ে ঢুকে কিছুটা এগিয়ে বাঁদিকে ঘুরতেই ছায়াঘেরা পঞ্চবটীর খোলা জায়গাটা আগের মতনই নজরে এলো। এখানেই ওনাকে প্রায় সময়ই দেখতে পেতাম। আরো কয়েক পা এগোতেই আশ্রমবাসীদের দেখা গেল। সবটা স্বাভাবিকই মনে হল কিন্তু চমক লাগলো আরো কাছকাছি যাবার পর। আশ্রমবাসীদের দেখলাম শুকনো মুখ ও অবিন্যস্ত চুলে সাদা পাজামা-পাঞ্জাবি, শাড়ী জামায় গোল হয়ে বসে আর সবার চোখেই কালোচশমা । কি ব্যপার? প্রাথমিক চমক কাটিয়ে চোখ পড়ল জেঠুর উপর। হাতছানি দিয়ে ডাকলেন, পাশে বসলাম। কিন্তু উনি কোথায় ? সবসময় তো ওনাকেই মধ্যমণি থাকতে দেখেছি। আজ দেখছি না কেন? একজনের মাথা ছাড়িয়ে সামনে দৃষ্টি প্রসারিত করতেই দেখতে পেলাম ওনাকে। না, রোদচশমা নয়, আজ ওনার খোলা আয়ত চোখে উজ্জ্বল রৌদ্রের নির্মল হাসি, সুন্দর বুদ্ধিদীপ্ত চোখ, সমুদ্রের গভীরতা যেন চোখদুটিকে ঘিরে, বনস্পতির মায়া জড়ানো চোখের পাতায়। হাসছেন, উনি হেসেই যাচ্ছেন চোখদুটি প্রসারিত করে। তবে সশরীরে নয়, ওনার জীবিত কালের একটি ছবি এনলারজড ফোটো-ফ্রেমে বাঁধানো, টেবিলের মধ্যিখানে রাখা। রজনীগন্ধার মালা পড়ানো, ধূপ ধুনো অগরুর গন্ধ ছড়ানো, ওনার প্রিয় পঞ্চবটীর আলো ছায়া পরিবেশ আর নীরবতা। বুঝতে কিছুই বাকি রইল না। দুঃখে শোকে ব্যথায়

অবনত মস্তকে বসে ভাবছিলাম রোদচশমাবাবুর সর্বাঙ্গীণ ব্যক্তিত্বর কথা, ঝরা পাতার মতো পিছনে ফেলে আসা কিছু স্মৃতিকথা।

সম্বিত ফিরলো বেশ কিছুক্ষণ পর যখন আশ্রমবাসীদর কেউ কেউ ওনাকে স্মরণ করে ও ওনার আত্মার শান্তি কামনা করে দু চার কথা বলতে থাকলেন । এমন একজন গুণী জ্ঞানী প্রাণবন্ত প্রাণোছল বন্ধুবৎসল হিতকারী মানুষের প্রয়াণে সবাই একান্তভাবে শোকাহত, মর্মাহত। নীরবতা পালনই বোধ হয় ওনাকে শ্রদ্ধা জানানোর প্রকৃষ্ট পন্থা বলে সভায় সবাই মোটামুটি চুপচাপই ছিলেন। আরো কিছুক্ষণ পর এক অশীতিপর বৃদ্ধ লাঠি হাতে অতি কষ্টে উঠে দাঁড়িয়ে কিছু বলবার চেষ্টা করলেন। বৃদ্ধের শীর্ণ শরীর, শোকাচ্ছন্ন মন, ক্ষীণ গলার স্বর ।ইনি আশ্রমের বাইরে থেকে আসা লোকজনের মধ্যে একজন। নাম বলে ছিলেন সোমনাথ বাসু, একজন চক্ষুশল্য বিশেষজ্ঞ হিসাবে ভীষণ সুখ্যাত ছিলেন দেশে বিদেশে । হিরণ্ময়বাবুর সঙ্গে কোথায় কিভাবে তাঁর পরিচয় ও সেই পরিচয় কখন প্রগাঢ় বনধুত্বে পরিণত হল সেকথাই উনি আস্তে আস্তে বলতে থাকলেন। একটা চেয়ার টেনে ডক্টর বাসুকে বসতে অনুরোধ করা হল। বয়সে প্রায় বছর ১০-১৫র পার্থক্য ও দুজনার কর্মক্ষেত্র ভিন্ন হয়েও তাঁরা কেন বন্ধু হয়ে রইলেন সেকথাই সোমনাথ বাসু বলতে থাকলেন। আশ্রমবাসী ও অন্যান্যরা চক্ষু রহস্যের উপর কিছু আলোকপাতের আশায় একটু নড়ে চড়ে বসলেন।

বছর ২০ আগে কোলকাতা মেডিকেল কলেজের চক্ষু বিভাগের প্রধান মানে Head of Department ছিলেন সোমনাথবাবু। সেই সময়ই অপারেশন টেবিলে দেখা হয় হিরণ্ময়বাবুর সাথে। হিরণ্ময়বাবু এসেছিলেন ডান চোখের ক্যাটারাক্ট অপারেশন করতে। অপারেশন চলাকালীন পাশের এক ঘর থেকে দুই নারী কণ্ঠের কান্নার আর্তনাদ ভেসে এলো দুই পুরুষের কানে। ডক্টর ও পেশেনট দুজনাই শুনতে পেলেন সেই সকরুণ ফোঁপানির আওয়াজ ।কান্নার মধ্যেই এত সুগভীর অসহায়তা অন্তর্নিহিত ছিল যে ডক্টর সার্জেন্টের হাত বন্ধ ছিল কিছুক্ষণ।উনি বুঝতে পেরেছিলেন ঐ নিদারুণ কান্নার সূত্র কি । কারণ অল্প কিছু আগেই Advanced Retinal Artery Ocular Disorder এ দুচোখ আ্ক্রান্ত বছর ১৫র একটি মেয়ের চোখ অপারেশন করে এসেছেন আর সেখানে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছেন সোমনাথ বাসু। মেয়েটির কেস নিঃসন্দেহে জটিল ছিল, তাঁর প্রচেষ্টাও ছিল ১০০ ভাগ, তবুও সারাজীবনের জন্য মায়ের একমাত্র সন্তান পর্নার চোখ থেকে পৃথিবীর সব আলো, সব রং, সব আশা মুছে গেল।

'A Case of acute optic neuropathy permanent Monocular Vision Loss' বিড়বিড় করে আওড়ে গেলেন প্রখ্যাত আই সার্জেন্ট সোমনাথ বসু অপারেশন টেবিলে । তাঁর এই সিদ্ধান্তটাই উনি জানিয়ে এসেছেন পর্নার বিধবা মাকে কিছুক্ষণ আগে। অস্থির, ব্যাকুল ও কিংকর্তব্য বিমুঢ় হয়ে পড়লেন তিনি। কারও দৃষ্টিশক্তির স্বচ্ছতা বাড়ছে আবার একই পৃথিবীতে কারও দৃষ্টি শকতি ফুৎকারে নিভে যাচ্ছে। সামলাতে পারছিলেন না নিজেকে । এতখানি আবেগপ্রবণ হয়ে বিচলিত হয়ে ওঠেননি কখনও । তাঁর কিসের যশ খ্যাতি মান সম্মান প্রভাব প্রতিপত্তি সম্মান, কি দাম আছে তার? একটা ছোট জীবনে পৃথিবীটাকে চেনা জানার আগেই হারিয়ে গেল অন্ধকারে। এই সব চিন্তা ভাবনার মধ্যেই তিনি হিরণ্ময়বাবুর অপারেশনটা শেষ করলেন। কি করবেন তিনি এখন, কিছু কি আছে এই পরাজয়কে উপেক্ষা করার । অপারেশন টেবিল ছেড়ে যাবার আগে তাঁর পেশা, মানসিকতা, আবেগ, স্নেহবাৎসল্য, দম্ভ, করুণা , মা-মেয়ের অসহায়তার ছবি সব মিলিয়ে এক অদভুত অজানা প্রতিক্রিয়া ঘটে গেল ডঃ বাসুর মনে। অসম্ভব জেনেও দৃঢ় প দক্ষেপে ঘুরে দাঁড়ালেন ডঃ বাসু।

ভিক্ষা চাইলেন ডঃ বাসু , হাঁ - ভিক্ষাই চাইলেন । যার চোখের অপারেশন সুসম্পন্ন করলেন এইমাত্র সেই ব্যক্তির কাছে। যে চোখের স্বচ্ছতা ফিরিয়ে আনলেন সেই চোখটিই দান চেয়ে বসলেন। হাতে সময় খুব কম , অল্প কথায় পুরো ব্যাপারটা বললেন, বোঝালেন, অনুরোধ ও আবেদন রাখলেন হিরণ্ময়বাবুর কাছে। দুই নারী কণ্ঠের সব হারানোর কান্নার রোল হিরণ্ময়বাবুর কানে তখনও বাজছিল , তাঁর দয়ালু সংবেদনশীল মনেও গভীর দাগ কেটেছিল। পুরো পরিস্থিতি অনুধাবন

করে উনি সম্মত হলেন ডঃ বাসুর আবেদনে। তাঁর সদ্য অপারেশন হওয়া চক্ষুটি উনি স্ব -ইচ্ছায় দান করতে রাজী হলেন অন্ধ হয়ে যাওয়া পর্নার জন্য। ভাবলেন, পৃথিবীর অনেক কিছুইতো আনন্দ -উপভোগ করলেন, এখন তার চোখ দিয়ে অন্য একটি জীবনে যদি কিছু আশা স্বপ্ন পূর্ণ হয় সেটাই মহত্ত্বের , সেটাই সুখের, সেটাই মানবিক। দান করা চক্ষুটি নিয়ে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা নিরীক্ষার পর পর্নার চোখে কর্নিয়াটি transplant করতে সক্রিয় হলেন সার্জেন্ট বাসু।

এরও দিন সাতেক পরে হিরণ্ময়বাবু ও পর্না শারীরিক ভাবে সুস্থ হলে দুজনকেই চোখের পরিচর্যার উপর করণীয় যা কিছু বুঝিয়ে দিলেন। বিদায়পর্বে ডঃ সোমনাথ বাসু এক জোড়া করে দামি রোদচশমা হিরণ্ময়বাবু ও পর্নার হাতে তুলে দিয়ে দুজনের সর্বাঙ্গীণ কুশলতা কামনা করে ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বিদায় নিলেন। শেষবারের মত পর্না হিরণ্ময়বাবুকে পিতৃতুল্য জ্ঞানে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে প্রণাম করলে ও আশীর্বাদ নিয়ে বিদায় নিলে । হিরণ্ময়বাবু ডঃ বাসুর দেওয়া রোদচশমাখানি দিয়ে চোখ ঢাকলেন। জীবনের এক কঠিন ও বাস্তব সত্যের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সিদ্ধান্ত নিলেন জীবনের নতুন অধ্যায়ের। অপ্রস্তুত তবুও ঠিক করলেন, অধ্যাপনার কাজ থেকে স্বেচ্ছা-অবসর নিয়ে জীবনের বাকি দিনগুলো আশ্রমবাসী হয়েই থাকবেন - তাঁর নতুন ঠিকানা হোল 'শেষের কবিতা' বৃদ্ধাশ্রম। অকৃতদার হিরণ্ময়বাবুর তেমন পিছটান কিছু ছিল না।

স্মৃতির ঝুলি থেকে কথাগুলো বলে থামলেন ডঃ বাসু, দীর্ঘশ্বাস পড়লো বড়, মনে হল ওনার বুক থেকে এক ভারী পাথর নেমে গেল। নির্মল নীরবতায় ভরে গেল পরিবেশ, শোকসন্তপ্ত আশ্রমবাসীদের সান্ত্বনা দেবার অভিলাষে দিনশেষের রক্তিম সূর্যের স্নিগ্ধ আলো সকলকে ছুঁয়ে থাকলো আরো কিছুক্ষণ । সদ্যপ্রয়াত রোদচশমাবাবুকে স্মরণ করে সমবেত কণ্ঠে গান শুরু হল,

'আমার মুক্তি আলোয় আলোয়,.....এই আকাশে'।

কবিগুরু এই গানে কোন বা কার মুক্তি ও কোন আলোর ইঙ্গিত করেছেন ? শোকার্ত হৃদয়ে মানসীর সঙ্গে আলোচনা করতে করতে বাড়ীর পথে পা রাখলাম।

----- XX -----

Beautiful British Columbia (2)

Tanima Majumdar

দুটি ফুল জল রঙে -

Shila Biswas

South African Animals, Kruger

Jharna Chatterjee

The Lion King

Elephant Herd

Three giraffes nibbling at thorns

“KRISHNOKOLI” of Rabindranath

Arun Roy

TRIVENI OF OUR BACKYARD IN OTTAWA (CANADA) & VARANASI (INDIA)

Nirmal K. Sinha

The word, Triveni (triune- or trinity-region) is not inconsequential to Hundu minds. The name primarily springs up wide-ranging thoughts of Triveni Sangam (confluence in Sanskrit), the convergence of two major rivers of India, Ganga (Ganges) and Yamuna, and the present-day imaginary subterranean and legendary Rigvedic Saraswati River. It is a place of religious importance near the city of Allahabad and identified readily to its association with the Kumbh Mela held every 12 years.

The land around the Ganga-Yamuna sangam is flat. The meeting area of the rivers is not readily visible unless you flying over it in a helicopter. However, depending on the season and weather conditions, relatively muddy water of the Ganga can be distinguished from the clear blue water of deeper Yamuna. In a similar yet different way, but because there is a vantage point for observation from a higher rocky level, the demarcation line between the main stream of the Gatineau River can be identified from that of the mixed waters of Ottawa and Rideau rivers in Ottawa, Canada (Fig. 1).

Figure 1. View from lookout-point on Rockcliff Parkway across Ottawa River showing the demarcation zone in the water; the bridge over the south-flowing Gatineau River and Gatineau hills in the north; Triveni Sangam of Ottawa River, Rideau River and Gatineau River is on the left (just after sunrise, 1 July, 2012)

The junction of three rivers, Ottawa, Rideau and Gatineau (ORG), is the Triveni Sangam of Ottawa. It's in our backyard. There is no easy access to the waters of the Triveni from the Ottawa side, except through the Ottawa New Edinburg Club (ONEC) sailing club house on the east of the look-out point. It is easier, however, to go on the river from the Gatineau Point as can be seen in Fig. 1. But Tiveni of Ottawa is unique. Nobody can "walk" on the water at any sangam in the world, as we can do here at ORG. For us living in Ottawa area, the capital region of Canada, winter months actually open up opportunities to "walk" in the ORG-sangam area. During the winter months, one can walk on the ice as I did many times, provided you are wearing a floater suit, especially designed for such winter operations. I used to love doing just that, wearing of course, the special floater suit. While walking on the solid-water, I could feel close to Mother Nature and appreciate rare beauty of the confluence of north-to-south flowing Gatineau River, south-to-

north flowing Rideau River and west-to-east flowing Ottawa River (heading towards Montreal to join St. Lawrence River). The location is very close to Rideau Falls (Fig. 2) discharging the water of the north flowing Rideau River. It is because of this falls, we have the Rideau Canal and the series of locks (UNESCO heritage site), built to allow boats to navigate from Ottawa River. This ORG can be seen clearly during the winter when the trees have no leaves (Figure 3) from the 'lookout point' on the Rockcliff Parkway. This road is an extension of the Sussex Drive to the east beyond two well-known residents: the Prime Minister and the Governor General of Canada. In fact, by keeping an eye on the progression of ice formation in the rivers, it is possible to pin-point the location of our Triveni of Ottawa as illustrated in Figure 4.

Figure 2. Winter beauty of the Rideau Falls discharging water of the north-flowing Rideau River to Ottawa River

Figure 3. View of snow and ice covered confluence of three rivers from the Rockcliff Lookout (45.4560N, -75.6899E) on Rockcliff Parkway in Ottawa, illustrating west-to-east flowing Ottawa River, south-to-north flowing Rideau River leading to Rideau Falls and north-to-south flowing Gatineau River

Figure 4. Triveni Sangam of Ottawa, Rideau and Gatineau Rivers (ORG), revealed by the apex of parabolic ice sheet during the middle of winter (photo taken on 27Dec, 2013)

There are several tri-river junctions of minor religious importance for Hindus, other than Triveni at Allahabad, within the subcontinent of India. But very rarely we hear about the confluence of Ganga, Varuna and Assi as a sangam at one of the oldest, but one of the most vibrant living cities of the world, the city of Benaras or Kashi. The present-day name of Varanasi for Benaras is derived from the two primarily east-flowing rivers - Varuna and Assi meeting Ganga. The city is famous for more than 80 Ghats (stepped access to the river) lining the western shore of Ganga, between Assi Ghat in the south and Raj Ghat in the north. Geophysically, Varanasi is unique in its shape and location on the north-flowing Ganga. Here, Ganga is crescent-shaped like the waxing moon in the first quarter in Shukla Paksha. The entire eastern-shoreline and the land are in the flood-plain of Ganga. No residential areas could be developments for thousands of years including the present. The spectacular view of the rising Sun (Surya) is unobstructed from any of the ghats for welcoming the source of life with Rigvedic mantras during dawn (Usha). What a view, as Surya-deva embraces Usha-devi and brightens the land!! No wonder, why the morning prayers welcoming the source of life on our Earth became an integral part of Hindu life.

Taking a bath in Ganga is a must for all Hindu pilgrims visiting Benaras. The city of Shiva is also known for silk brocades and Benarasi saris. I love to walk from ghat to ghat in December when the pilgrims and the tourists shy away from near-freezing temperature of the Varanasi ghats. Ganga dries up significantly to expose the steps of the ghats and the weavers of silk sarees take full advantage of the open spaces (Fig. 5). I also like to visit the shores of Ottawa River during the winters from December; the ice-fishermen along the river also take advantage of the downstream areas from ORG to set up huts on the ice for fishing. But, one of my secrets of joy is the correspondence between the whole spectrum of colours, like the Benarasi saries, hidden within the snow and ice mass (Fig. 6).

Figure 5. Silk sarees drying on the steps after dyeing and tinting (photos taken in December, 1996) - The wide ranging vibrant colours of silk saris spread out on the winter-ghats of Varanasi takes me to the inner beauties of white snow and colourless crystal-clear ice of the Triveni of Ottawa. Who can guess that the snow cover on the ice sheet could look like the embroidered, silk brocades, intricately designed borders and bodies of the Benarasi silk saris? How else can I describe the microstructure of snow layer on top of columnar-grained ice I have seen through polarized light (Fig. 6)?

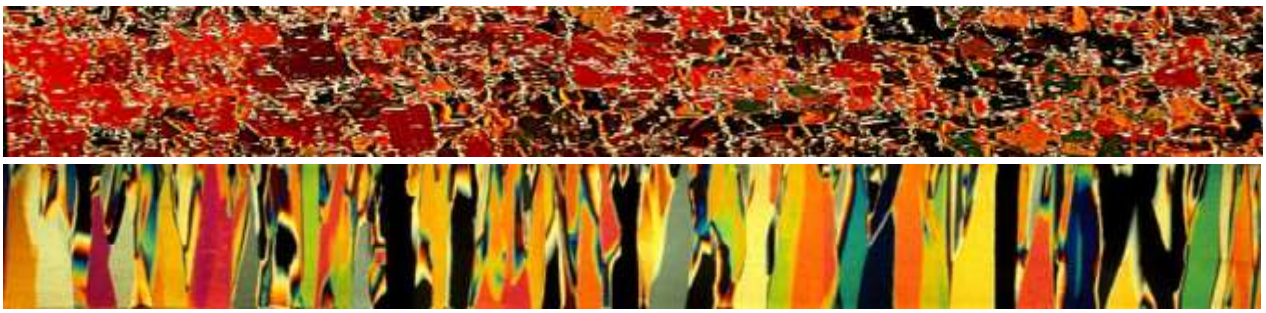

Figure 6. Microstructure of snow (top) and ice (bottom) of ice sheets at Triveni of Ottawa may provide a passage through the art world of famous silk brocades and Benarasi saris

The month of December is the season of quietest time in Varanasi. Only the very brave locals go to the river for quick morning dips in the river. Even during the day times, most of the ghats are relatively empty. My favourite moments are, of course, those of my lonely child-hood memories as a refugee-child while sitting on the steps of the beautiful Shiva Temple (Fig. 7) adjacent to Manikarnika cremation ghat. This is popularly known as the Matri-rin (meaning 'mother's debt') mandir symbolizing that nobody can repay mother's debt. The builder of this temple dedicated it to his mother and declared that he was finally free from his obligation to his mother. Soon, the structure sled and got submerged in Ganga. Most of this temple is submerged during the monsoons, but rises as the flood-water recedes. As the winter approaches, Ganga remains relatively full to cover the steps, providing superb views of the ghats. However, the steps remain essentially empty in December including the most popular Dasaswamedh and Manikarnika ghats (Fig. 8).

Figure 7. In December, the Matri-reen mandir and steps are out of the water, but lonely (left, 1996) whereas Harish Chandra cremation ghat takes new look through the young cricketers (right, 2003)

Figure 8. Varanasi Ghats - including Dasaswamedh and Manikarnika in December (1996)

As always, Monsoon flood washes all of human-sins throughout the subcontinent of India, not unlike the spring thaw of melting snow and ice in Canada. But probably nowhere this cleansing effect is as evident as in Varanasi. This is primarily because of the easy access to the water front. There is nothing in the world that compares Varanasi ghats when Ganga is full and the water sweeps the steps of all the ghats. The evening show of 'Ganga Puja" at Dahsashwamedh ghat is spectacular. It also provides several evening jobs for the good-looking students of the Benaras Hindu University (BHU). As the water recedes during the spring and summer, the ugliness of the careless habits of the people of the land becomes evident. There is no balance between the growth of industrialization and that of civic sense. The breathless stench of the

river full of human waste is temporarily replaced by incense smoke during the Ganga Pujas, but the reality returns very quickly as soon as the smoke clears.

Figure 9. View towards south from Shivala Ghat to Assi Ghat – while the dhobi washes soiled clothes, children share the highly polluted water with the water-buffalos (April 2012)

Figure 9. View towards north from Shivala to several ghats of Varanasi and fisherwomen selling the fresh catch, most probably loaded with heavy metals (April 2012)

As mentioned earlier, the name of Varanasi comes from the landmass between the rivers Varuna and Assi where they meet Ganga in the relatively short section where it changes the general west-to-east course and turns towards the north, like a crested moon. These rivers were flowing long before the existence of Ottawa, Gatineau and Rideau rivers were curved out of the rocks in less than about 8000 years during the latter part of the deglaciation in North America. Varanasi with rows of Ghats grew up slowly, over at least 3,500 years, on the western shore of Ganga. Almost 2500 years ago, on the outskirt of the city of Varanasi, an activist of the time for religious freedom, Siddharth, gave his famous sermon to a handful of his followers that heralded the beginning of Budhdhism. His teachings were forgotten and the Ganga Puja remained active.

As also mentioned earlier Triveni Sangam in Allahabad identifies the junction of three rivers, Ganga, Yamuna and Saraswati. Saraswati probably existed at one time, but disappeared many years ago with no visible traces at the surface level. Most probably it became a casualty of the global warming of the late Holocene Period. But then, the rivers of Ottawa, Gatineau and Rideau did not exist when most of Canada

was under a thick ice cover. These three rivers started their stronghold probably around 5,000 years ago when most of the ice cover melted away and the land, depressed under the ice load started to bounce back, called glacial rebound. As for the river Assi, it also became a casualty of the present cycle of global warming and practically dried up eventually. The depressed areas along Assi became a fertile land for dumping human waste, until it became a sorry trickle, a storm sewer. The existence of this river is now witnessed only by the Assi Ghat and the name of a road. Varuna has become a large drainage channel of raw sewer for the big city of Varanasi, dumping all the toxic and unprocessed sewage in Ganga. Fortunately, the meeting point of Varuna is on the north end of the city, away from the major ghats between Raj Ghat in the north and Assi Ghat in the south. Geophysics of the land is protecting the major ghats from the devastating effects of the dark grey-soupy Varuna with its dissolved and floating debris (as I have witnessed), but the affluent is travelling further beyond Varanasi. On the other hand, Varanasi is receiving the toxic waters of Ganga flowing through Kanpur (ranked top for air pollution in 2018) and then Allahabad. Yamuna flowing through Delhi is also like Varuna. It's difficult to accept that I used to swim in these rivers, during my childhood, when the water used to be clear blue during the winters. Today, the inhabitants of Delhi think that their drinking water comes from the tap and are not aware of the toxic characteristics of Yamuna, beyond any fashionable talk on climate change.

Triveni of Ottawa is healthy and doing well. Let's us keep it that way. A short afternoon drive can take you to this triveni any time of the year.

(বি)স্মৃতি তুমি.....।।

বাসবী চক্রবর্তী

যা বলি বা এখন যা লিখছি সবই a smattering of knowledge. ভালো বাংলায় বললে এদিক ওদিক থেকে ঝাড়া জ্ঞান। কোথা থেকে সেই জ্ঞান আহরণ করেছি উদ্ধৃতি দিতে পারব না তবে আশা করি সবই 'ব্যাদে' লেখা আছে।

শুনেছি পুরাকালে এক ঋষি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন সর্বজ্ঞ হয়ে - অর্থাৎ কিনা জন্মের আগেই এই জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে যা জানার বা আমরা সাধারণ মানুষ যা জানি বা জানিনা, সেই জ্ঞান তিনি নিয়েই জন্মেছিলেন। আবার এই সেদিন কোথায় দেখলাম যে যতদিন পর্যন্ত শিশুদের বাক্যস্ফূর্তি হয়না অর্থাৎ কিনা কথা দিয়ে নিজেদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে পারেনা, ততদিনের স্মৃতিও থাকেনা। প্রশ্ন উঠতে পারে যে তাহলে অনেকে ছোটবেলার কথা গড়গড় করে বলে যায় কিভাবে? স্মৃতি নাকি একরকমের নয় - তার বেশী - অর্থাৎ কিনা অভিজ্ঞতা নির্ভর ও শ্রুতিনির্ভর। এখানেই তো ঝামেলা, কাকে মানব - পুরাকালীন সত্য(?) না বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা। আবারও প্রশ্ন সত্য কি চাঁদ-সূর্য্য ওঠার মত চিরন্তন নাকি স্থান-কাল-পাত্র অনুসারে পাল্টাতে থাকে? নাঃ - এবার আমি ঝামেলাতে পড়ে গেলাম - বিষয়বস্তু আমাকে অতিক্রম করে যাচ্ছে মানে আমার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। তাই অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক্।

Truthiness এর সঙ্গে আজকাল আমরা সবাই অল্পবিস্তর পরিচিত হচ্ছি। শব্দটা যতটা নতুন ঘটনা তত নয়। রাজনৈতিক স্মৃতির ভাঙাগড়া তো সবসময়ই দেখছি। যদি একশ বছরে তিনটি প্রজন্ম আসে, রাজনৈতিক স্মৃতিকে উল্টোপথে চালনা

করতে এক বা দেড় প্রজন্মই যথেষ্ট। রাজনৈতিক স্মৃতিই তো কালক্রমে ইতিহাস হয় আর কোনভাবে যদি সেই স্মৃতির অভ্রান্ততাকে প্রশ্ন করা যায় কে বলতে পারে যে ইতিহাসের মেরুবিন্দুই পাল্টে যাবে কিনা!

এ তো গেল দেশ ও দশের কথা। এর পরেই আসে সামাজিক ও ব্যক্তিগত স্মৃতি। আমরা সামাজিক প্রাণী হিসেবে এক স্মৃতির বাঁধনে বাঁধা। এই স্মৃতির অনুষঙ্গের সামান্য তারতম্যে বহু বন্ধুবিচ্ছেদ, মনোমালিন্য ঘটে যাওয়াও অসম্ভব নয়।

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের ভ্রান্তি অথবা বিস্মৃতি সম্পর্কে বহুল প্রচলিত anecdote টির। রবীন্দ্রনাথ গিয়েছেন জগদীশচন্দ্র বসুর বাড়ি নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে। জগদীশ বসু বললেন যে তিনি তো আশা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিমন্ত্রণে আসতে পারবেন পরের দিন। রবীন্দ্রনাথ বললেন যে আসতে পারবেন না তাই জানাতে এসেছেন। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর তিনি বিদায় নিলে কথিত আছে জগদীশ বসু বললেন যে রবীন্দ্রনাথের স্মরণশক্তি আর আগের মত তীক্ষ্ম নেই। আর রবীন্দ্রনাথও তাঁর সঙ্গীকে বললেন যে জগদীশ বসু যে নিমন্ত্রণ করে ভুলে গিয়েছেন সেইটি তাঁকে তিনি বুঝতেও দিলেন না!

এই ধরণের গপ্পো প্রায় প্রত্যেকের ঝুলিতেই কিছু না কিছু আছে তাই বাড়িয়ে আর লাভ নেই। কেউবা একমাস আগের ঘটনা বেমালুম ভুলে গেল আর কারুর ছমাস আগে যাদের সঙ্গে পরিচয় হলো, পারস্পরিক প্রীতি-শ্রদ্ধা ইত্যাদির আদানপ্রদান হলো সেই পরিচয়পর্বের স্মৃতিই মস্তিষ্কের গহীন বিস্মৃতিপ্রদেশে অন্তর্হিত হলো। এই স্মৃতি-বিস্মৃতির খেলা সামাজিক জীবনে চলতেই থাকে। স্মৃতির বিনিময়ই আমাদের সব ধরণের সম্পর্কের মূল ভিত্তি। সেখানেই যদি টান পড়ে অথবা একের স্মৃতি অন্যের থেকে দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন করে তবে একই সূত্রে বাঁধা স্মৃতির মালিকদের একসঙ্গে পথচলা বন্ধ হয়ে যায়। অনেকটা your words against mine আর কি! কেউ ঠিক নয়, কেউ ভুল নয়।

তাই পরিশেষে একটা কথাই থাকে --- ধন্য স্মৃতি কুহকিনী!!

Khajuraho - Where Life, Love and Spirituality Mingle in Stones

Subhash C. Biswas

What is nightly gloom to unenlightened soul
Shines wakeful day to his clear gaze;
What seems as shiny day for all beings
Is dark night of ignorance.
To the Introspective Sage it is the night
When he remains aloof from worldliness."

Bhagavad-Gita

Introductory Scenario

The train arrives at Khajuraho in late afternoon; so the day's program has to be entirely forgotten. The weather is not favorable either. Rain, fog and cold have made Khajuraho an abode of gloominess. The tourists are all disappointed. Khajuraho is a small town in Chhattarpur district in Madhya Pradesh. The locals say, it is very unusual to have even a cloudy day in winter here, not to mention rain. Hopefully, tomorrow will be a better day according to the forecast.

The forecast comes true the following day; it is not as bad as yesterday. It is not something to be highly delighted about, but an overcast sky without rain may not deter anyone from making pleasure trips. Godadhar finds it fair enough to begin the tour. The hotel manager informs, the guide, Mr. Rajrishi Tripathi, is waiting in the lobby for his guests and the car is also ready with driver. Both Godadhar and Kamalika get in the car and proceed toward the temples.

Of the original eighty-five temples, the twenty two that survive constitute as a group one of the world's sculptural wonders. Architecturally too these temples surpass the beauty of most other temples of the period. Built during the period 950 to 1050 AD by multiple rulers, these temples are unique examples of Indo-Aryan architecture. They are known all over the world mostly for the exquisite beauty and abundance of their sculptures. The old-time travelers Al-Biruni and Ibn Battuta wrote about Khajuraho temples in their accounts. Al-Biruni, the Persian historian, accompanied Mahmud of Ghazni when the latter raided Khajuraho (Kalinjar as it was called then) in 1022 AD. Ibn Battuta visited India from 1335 to 1342 AD. In his chronicles, he mentioned about Khajuraho temples calling them Kajarra. He particularly noted that the temples contained idols that had been mutilated by the Moslems. Khajuraho temples were designed and built during the rule of the Chandella Rajputs. Being situated in an obscure village, the temples were out of sight and so were neglected for a while and thus fell victim to encroaching forests. During some Muslim dynasties, they were uncovered and some of the temples were desecrated. Then followed a long period of remaining unnoticed again and the temples sank into oblivion. They were rediscovered during the period of British Raj. In 1838, a British surveyor, Captain T. S. Burt, made a detour from his predestined route when his palanquin bearers spoke about the temples. He was thrilled discovering the temples and wrote "probably the finest aggregate number of temples congregated in one place to be met in all of India, and in an area within a stone's throw of one another." Years later, Alexander Cunningham visited Khajuraho and was astonished by the rich carving and the profusion of sculptures. In his report he grouped the temples into three distinct groups namely, Western, Eastern and Southern. The name of the village Khajuraho may have been derived from the Sanskrit word <*Khajuravahaka*>. *Khajura* means date palm and *vahaka* means bearer. There are other records that show that ancient Khajuraho was known as *Khjurvatika* meaning garden of date palms.

Myths and legends make the popular background stories of most religious events and monuments in India. The Khajuraho temples are no exception. Rather, because of the unusual religious and sensuous subjects of these temples, the accompanying legends are more colorful than expected. As said before, Khajuraho temples were built by the Chandella dynasty. Chandellas were one of the Rajput clans that claim to have descended from the Moon. There is a fascinating legend behind the founding of this great dynasty. The legend goes that there was once a beautiful young woman named Hemavati for whom these famous temples were built.

Hemavati was a daughter of the priest of Indrajit, the king of Kashi (Varanasi). She was exceptionally beautiful. One summer night she, out of some strange feeling, went to take bath in a nearby tank. Seeing a dazzling beauty swimming in water, the Moon God Chandrama descended on earth. Hemavati was seduced by Chandrama and the two spent the night in passionate union. Coming back to her senses at the break of the day, Hemavati became tormented by her misdeeds that would ruin her life. The thought of

concealing her disgrace from a censorious society consumed her. But the Moon God consoled her and prophesied that the offspring from this union would be a powerful king whose fame would spread all over the world. He would be called Chandravarman. As prophesied, the child Chandravarman was born; he was so brave and strong that at the age of sixteen he could kill tigers and lions with his bare hands. Chandravarman grew up to be a mighty king with a huge kingdom and built a fort that became famous and known as the fort of Kalinjara. He established his capital in Khajuraho that remained to be the capital of his successors too. Chandravarman is thus believed to be the progenitor of the Chandella dynasty. His deceased mother once paid him a visit in a dream; she implored him to build temples that would reveal, in addition to everyday themes, the passions that remain rooted in human mind. To fulfill his mother's wishes, Chandravarman invoked the divine architect Vishwakarma to build eighty five such temples. Thus eighty five glorious temples rose up in Khajuraho with sculptures of unimaginable beauty making up a repertory of wonderful scenes.

There are many variations of this story, which may suggest that these stories, though fascinating and romantic, are only imaginary tales fabricated to conceal the real origin of the clan and also to justify the profanity of some sculpted figures raising them to a level of sacredness. The actual history of Khajuraho may be quite different. The early history of the Chandellas is somewhat obscure. They were famous as kings of Jajakabhukti what is now known as Bundelkhand. The last of the Chandella kings, Parmardideva, ruled for thirty five years. In 1182, he was defeated by the mighty army of Prithviraj Chauhan and lost to him a big part of his territory. In 1202, he was totally defeated and executed by Qutubuddin Aibak and the Chandella kingdom fell to the grip of the Muslims.

Visiting the Temples

The car stops in front of the gate of a huge temple complex beautifully landscaped with an abundance of greenery and flowers, enclosed by a fence. The guide Rajrishi requests his visitors to follow him to a quiet secluded place where he talks of the essential facts about the Khajuraho temples.

"Most of the twenty two surviving temples of Khajuraho," Rajrishi begins, "were built by two of the Chandella rulers – Yashovarman and Dhanga. As you may know, the Muslim rulers frequently targeted Hindu temples for looting and destroying. Khajuraho did not escape from this vicious campaign. In 1495, for example, it became one of the main targets of Sikandar Lodi. But by God's grace, its remoteness and isolation from big centers were boon in disguise; Khajuraho was saved from too many invasions and too much destruction."

"Usually there're waterbodies near temples, are there any here?" Kamalika asks.

"Yes, yes, there're. Shib Sagar is one nearby, and then there's also Khajur sagar and Khudar Nadi. There were more as the locals believe. Well, now coming back to the temples, there're mainly two schools of Hinduism namely Shaivism and Vaishnavism, and then there's Jainism. Of the twenty two temples, seven are dedicated to Shiva and his consorts, another seven are dedicated to Vishnu and his affinities and three to Jain Thirthankars. All these three different groups were constructed in the late tenth century and also were worshipped in the same time. This illustrates, as the scholars say, tolerance and respect among these religions."

"Sculptures on Khajuraho temples," continues Rajrishi, "you'll agree with me when you see them, are among the masterpieces of the medieval India. These sculptures have been classified broadly into five categories. The first one includes formal images of principal deities such as Vishnu, Shiva, Thirthankars, etc. The second one comprises Gods, Goddesses, Apsaras, Celestial Nymphs, etc. The third category consists of Mithunas that's playful union of couples. This last category is one form of temple art for which

Khajuraho has been famous the world over. These images have a minor exposure on the temple walls. They may escape your notice unless you're particularly looking for them. In the fourth category, various activities of daily life have been depicted. The fifth category comprises sculptures of animals like lions, tigers, elephants and other fabulous beasts."

"Are there images depicting mix of categories?" Godadhar asks.

"Sure there're; but these are the basic categories. So if there're no more questions, let's proceed to the temples. We'll begin with the Western Group and after we'll cover the rest."

"The way the images are categorized as you said, appears that the temples all have similar images," remarks Kamalika.

"Most visitors make similar comments but after they've visited them. If you look critically, you'll discover some distinctive differences amidst sculptural harmony. Shall we proceed now?"

North side of the Western Group of Temples

The gate opens into a vast complex enclosing a cluster of temples.

"It's a magnificent view," exclaims Godadhar. "Art, architecture and natural beauty have mingled together in this park. It not only pleases your eye, it also elevates your spirit."

"I'm simply speechless," says Kamalika.

Lakshmana Temple

This is the earliest Vaishnava Temple that has all the *Panchayatana* (five-shrined) shrines still standing. It is well-preserved with all the principal elements like *Aardha-mandapa* (Entrance Porch), *Mandapa* (Front Hall), *Mahamandapa* (Great Hall), *Antarala* (Vestibule) and *Garbhagriha* (Sanctum) with an ambulatory. The *Jagati* (Platform) is also well-preserved with its moldings and friezes of battle scenes, hunting, procession of elephants, horses and soldiers and various other representations including scenes from daily life. The entire Temple wall is covered with ornately carved sculptures from the base to the crown. Apsaras are shown in dancing postures with offerings or playing musical instruments.

Lakshmana Temple with four subsidiary shrines

Godadhar remains absorbed looking at the temple in total amazement.

“What’re you thinking?” Kamalika asks.

“Firstly, I’m looking at something outlandish. It seems humanly impossible, yet it’s human creation. All the temple walls are covered with an exceptional design conception, a profusion of sculptural art, sublime in expression manifesting mirth, devotion and graceful sinuosity. It’s a rare experience in my life. Every piece I look at is a masterpiece.”

“Well said, your verbosity is fathomless,” says Kamalika glancing at Godadhar with a taunting smile. “And secondly?”

“Secondly, let’s continue our tour.”

Facing the entrance of the Temple, there is a shrine dedicated to goddess Brahmani, locally popular as Devi. The guide says, it was originally dedicated to Garuda. The Temple stands on a huge platform terrace rectangular in shape, on the four corner of which are placed the four other subsidiary shrines. These shrines are also decorated with ornately carved sculptures. The entrance gate, called *Makara Torana* (arch with sculptured crocodiles, a garland-like structure), leads into the *Ardha-mandapa*. The latter has pillars with relief of scrollwork and ceilings with miniature figures of *nagas* (snakes) and floral cusps. The doorway to the Sanctum has a central panel with sculptures of nine incarnations of Vishnu namely, *Matsa* (Fish), *Kurma* (Tortoise), *Varaha* (Boar), *Narasingha* (Man-lion), *Vamana* (Dwarf), Rama, Parashurama, Krishna and Balarama. The lintel is decorated with an image of Goddess Lakshmi flanked by Brahma and Vishnu and surmounted by friezes of nine planets. The Sanctum walls are also embellished with two rows of sculptures depicting many legends of Krishna. It enshrines an idol of Vishnu in Vaikuntha with three heads and four arms. It is interesting to note that the three heads are of three different creatures – a human head at the center flanked by one of a boar and one of a lion. Other sculptures in the interior of the Temple are also remarkable, especially a dancing Ganesha and those with expression of spiritual ecstasy. According to Archeological Society of India, this Temple was built between 930 and 950 AD during Yashovarman’s rule.

Godadhar and Kamalika stroll on the terrace around the Temple. “This is a wonderful place,” says Kamalika. “The beautiful art mingles well with the beautiful nature around. The artistic essence and the exuberance of these sculptures have filled up my mind with ecstatic delight.”

“You know Malika, these temples in Khajuraho have been adored by millions of visitors and worshippers over hundreds of years,” utters Godadhar looking thoughtfully at the temples. “They have also been invaded

and ravaged by foreign army, vandals and miscreants. Yet today they stand boldly and gracefully attracting millions more from far and wide. It amazes me."

Kamalika listens quietly and attentively and responds by a short utterance. "Let's proceed to the next Temple."

Varaha Temple

The guide Rajrishi leads his visitors to another temple relatively small but drawing a large crowd. Facing the huge Lakshmana Temple blissfully stands the awesome Temple of Varaha, the third incarnation of Vishnu. The Temple may appear simple and modest, but it enshrines a gigantic statue of Varaha that is 2.5 m long and nearly 1.5 m high. Sculptured out of single, colossal sandstone, this statue is carved with numerous figures on its entire body depicting gods and goddesses of Hindu pantheon. One of these figures attracts most attention, which is the one on its snout. This figure is of Goddess Saraswati with veena (lyre) in her arms.

"I'm curious to know how many figures there are on Varaha," says Kamalika.

"There're a total of 674 deities on this body," says Rajrishi.

"What that snake doing there, and those two footprints?" Kamalika asks pointing at the sculpture of a snake lying on the pedestal between the two front limbs of Varaha and a pair of feet near it.

"That snake is *Sheshnag* (Vishnu's Serpent) in a devotional posture safeguarding the feet of *Prithvi*, the Earth-goddess."

"Seems some kind of mythological story there behind them," asks Kamalika eagerly.

"Yes M'me, there's a very interesting legend in Varaha Purana, you probably know," Rajrishi responds. "You've certainly heard of the demon king Hiranyakashipu and his brother Hiranyaksha."

"Yes, everyone has heard about them." Both Godadhar and Kamalika respond.

"The story of Hiranyakashipu everyone knows but not of Hiranyaksha. Anyway, these two brothers were actually Jay and Vijay in their previous birth when they were great devotees and also gate keepers of Lord Vishnu. They were once cursed by Brahma's son when the latter was not allowed to enter. So they were born as demons in their next life. Now, interestingly, Hiranyaksha happened to be a great devotee of Lord Brahma. So he prayed to Brahma and got a boon from him, by virtue of which no human, no Asura or even god would be able to kill him. Consequently, he became an extremely powerful, indomitable, and dangerous demon for the whole creation. So Vishnu was invoked by all gods to confront him and save the creation. For this, Vishnu had to reincarnate as an animal, a boar in this case, to be able to kill this demon. There was a fierce battle between them that lasted thousand years. Hiranyaksha took the Earth (Prithvi) away and hid it in the cosmic ocean. Varaha finally defeated and killed Hiranyaksha and rescued Earth on the top of his snout and restored it at its right place in the universe. Earth was devastated in this process and Sheshnag had a roll in preserving it."

Kandariya Mahadeva Temple

“So those feet are of Goddess Prithvi being preserved by Sheshnag, right?” Kamalika asks.

“Yes, and it’s funny to note Vishnu as Varaha married Prithvi who is also known as Bhudevi.”

“So that’s the story, very interesting,” says Kamalika.

“The ceiling is flat, I notice,” remarks Godadhar. “It’s also beautifully carved with a lotus flower in relief, wonderful.”

“When was this Temple built?” Godadhar asks.

“It’s dated from 900 to 925. Now let’s move to the next one.”

Matangeshwara Temple

Close to Lakshmana Temple and directly opposite to Varaha Temple, stands another small temple called Matangeshwara Temple. Simplest among all Khajuraho temples and devoid of sculptural exuberance, this Temple is the holiest here. Its interior is remarkably simple without any sculptural ornamentation.

“Its simplicity suggests it’s one of the earliest temples of Khajuraho,” says Rajrishi. “Probably was built between 900 and 925. But its best part is the Linga in the Sanctum. It’s a massive one, some 2.5 m in height and 1 m in diameter. And see there’s a priest, the Temple is still alive and worshipped by devotees. That makes it the holiest.”

“You don’t get bemused with artistic glamour here and so can be fully devoted to God. That’s the idea, right?” remarks Godadhar.

“You’re not amused either,” Kamalika chimes in. “Deprived of external entertainment, you feel compelled to look for spiritual one.”

“During Shivaratri festival,” Rajrishi continues, “thousands of pilgrims congregate in this shrine and a big fair becomes a point of attraction.”

Kandariya Mahadeva Temple

From the Lakshmana Temple area, Rajrishi leads his visitors to the next wonder of Khajuraho, Kandariya Mahadeva Temple. “Dedicated to Lord Shiva, this Temple is the most amazing among the Khajuraho temples,” Rajrishi says. “It’s also the largest and loftiest. It stands on a plinth of 31 m in length and 20 m in width. According to many scholars, Kandariya Mahadeva Temple is one of the architectural wonders of India. Originally, this Temple like Lakshmana Temple was of *Panchayatana* (having all five shrines) type, but the four subsidiary shrines, supposed to be on the four corners of the terrace, are non-existent now. Even without these subsidiary shrines, you’ll agree with me I’m sure, this grand Temple bewilders the visitors by its immensity and graceful features.”

The towering superstructure has an extra-ordinary composition of intricately ornamented *shikharas* (towers). The main central *shikhara* is surrounded by an ascending series of eighty four smaller replicas of itself, which produces a graceful harmony and rhythm in the structural design. Like a full-fledged temple, Kandariya Mahadeva Temple has all the six essential parts – Entrance Portico, *Mandapa*, *Mahamandapa*, *Antarala*, Sanctum and Ambulatory. Each of these parts has its own roof designed as a towering peak embellished with sculptures. This grand superstructure represents, the guide says, the Mount Kailash of the Himalayas, the mythical abode of Lord Shiva. The platform of this Temple is also unique among all Khajuraho temples. It has the loftiest basement with horizontal bands intricately carved. They include processional friezes teaming with horses, elephants, warriors, acrobats, hunters, devotees, dancers, musicians and also some unabashedly sensuous scenes. The beauty of these vibrantly alive arrays of sculptural art allures the visitors who remain spell-bound with the immensity and gorgeousness of what they witness.

Looking at the enormous wealth of carvings and profusion of sculptures, Godadhar says, “I wonder how many hundred figures have been carved on this Temple.”

“There’re nearly nine hundreds of them, Sir,” responds Rajrishi.

“Shall we go inside?” asks Kamalika.

“Yes, follow me please.”

“The interior of this Temple is more spacious than other temples and gorgeous too,” says Rajrishi. This is the only Temple here that has two *Makara-toranas*. Look at their design, so beautiful. The ceilings are also lavishly carved. The lintel of the Sanctum has rich flower carvings. The Sanctum enshrines a Linga made of marble, a rare thing.”

“Which ruler built this Temple?” asks Godadhar.

“It was built during the reign of King Vidyadhara sometime between 1025 and 1050. Now we move to another temple, shall we?”

Jagadambi Temple

This Temple is much smaller in size but equally rich in sculptural ornamentation. Standing on a lofty platform contiguous with that of Kandariya Mahadeva Temple, Jagadambi Temple was originally dedicated to Vishnu. The Sanctum enshrines an idol of Parvati or Devi Jagadambi, the Goddess of the world. This Temple is also known as Kali Temple as the idol is painted black.

Despite its small size, Jagadambi proudly stands with most amazing sculptures. One can witness here some of the finest figures of Lord Vishnu, an unusual three-faced eight-armed figure of Shiva and a dignified one of Yama, God of Death. Artistic conception and composition are so captivating here that the tourists stand in awe and wonder-struck looking at the sculpted figures, especially of amorous couples and *surasundaries* (Nymphs). Some of them are masterpieces of Chandella style, which transcend the mind of the visitors from physical to spiritual level.

Godadhar and Kamalika along with Rajrishi come down the stairs to the level ground.

Jagadambi Temple

“I guess,” comments Rajrishi, “tourists come to Khajuraho mainly for the obscene sculptures. I may be wrong, I wish I’m.”

“No, I don’t think so,” retorts Kamalika.

“I agree with Kamalika,” comments Godadhar. “People, I’ve noticed, are profoundly charmed by the artistic wonders sculpted in stones. Some might feel uncomfortable though, but that feeling is not evident among the visitors I’ve encountered.”

“I’ve noticed indifference when visitors pass by those figures,” remarks Kamalika. “But my point is why those kings exploited the best artistic talents of the time and spent enormous amount of money to carve such indecent figures and put them alongside the religious ones. What persuaded them to do so?”

“I may add to your point saying that Mahatma Gandhi found those figures so indecent and offensive that he ordered his pious disciples to demolish them, and it needed Rabindranath Tagore to come forward and intervene to stop him.”

“Yes, that was a wrong move by Gandhi,” says Kamalika. “But there must be a deeper meaning behind all these. The superficial physical aspect can’t be the objective of these figures presented along with the spiritual ones.”

“There’re many other scholars nurturing various thoughts, philosophical or otherwise. But I’m particularly impressed by lessons of Gita,” says Godadhar. “One intriguing idea is that the physical aspects of love depicted here may have the objective of building a barrier that only a pious mind can overcome and reach a higher level of spirituality. Others may remain submerged in the worldly enjoyment and get perished. As Gita says, only he whose senses are restrained from all objects possesses perfect wisdom.”

Rajrishi along with Godadhar and Kamalika walk across the field to the north-east end of the complex and arrive at the Vishwanatha Temple.

Sculptures on a wall of Jagadambi Temple

Vishwanatha Temple

“This is the great Vishwanatha Temple,” declares Rajrishi. “Unfortunately, we can’t see the Temple at close. As you can see, it’s under renovation. You’ll have to be satisfied with whatever I can tell you about it.”

Paying no heed to Rajrishi Godadhar keeps on gazing at the Temple. “It’s gorgeous,” he says. “Even through the scaffoldings I can see the sculptures embellishing the entire Temple; it’s mind blowing.”

“Yes, undeniably,” says Kamalika. “You may tell us about the Temple, Mr. Tripathi. To me it looks pretty much like Kandariya Mahadeva Temple.”

“Yes, Madam, architecturally it resembles Lakshmana Temple to some extent and Kandariya Mahadeva to a great extent. Vishwanatha Temple is another great monument of Khajuraho. As you can see, it’s similar to the plan and design of Kandariya Mahadeva with soaring towers, all decorated with beautiful sculpted figures, the most beautiful in my judgement, especially the female figures. This Temple is also of *Panchayatana* type like Lakshmana, but only two of the four subsidiary shrines have survived – one on the north-east and one on the south-west corner. We can’t go inside, too bad, but there it has all the five shrines like entrance, Mandapa, Mahamandapa, Antarala and Sanctum enclosed by Pradakshina (ambulatory). Inside also you’ll see beautiful sculptures, some of them are special.”

“Those towers, how many are there? Same as in Kandariya Mahadeva?” asks Kamalika.

“No, less by a few only, and they’re simpler in design.”

“This Temple has a Nandi Shrine too, I see.”

“Yes, there it is on the same high basement terrace facing the Temple. The Nandi idol is massive; it’s 2.2 m long and 1.8 m high.”

“Umm ----,” Godadhar comes out of his spell-bound state, “its architectural grandeur is unquestionably impressive. And the sculptures, my god, so luxuriant and glamorous. Who built it by the way?”

“Chandella king Dhangadeva built this Temple. Oh, by the way, we’ve left behind another temple.”

“Which one?”

“**Chitragupta Temple**. It’s not a big one though. Like Jagadambi Temple, it too is lavishly adorned with sculptures.”

“Which god it’s dedicated to? Chitragupta?”

“No, it’s Sun Temple Madam, the only Sun Temple in Khajuraho. In the Sanctum you can see the image of the Sun God, Surya, standing in a chariot driven by seven horses. This sculpture is really remarkable, everyone appreciates. Jagadambi and Chitragupta are quite alike; should we go see anyway?”

“No, let’s move on to the next big ones,” sermons Godadhar.

“Leaving aside a few small ones, this completes the Western Group of temples. And yes, there’s another mentionable, the **Chausath Yogini Temple**. Though in a ruined condition now, it’s the earliest monument in Khajuraho and the only one here made of granite. So that’s it, we can now move on to Eastern Group of temples. Please follow me.”

The Eastern Group of Temples

This group includes three Hindu temples – Brahma, Vamana and Javari – and three Jain temples – Ghantai, Adinath and Parshwanath.

“The main attraction in Khajuraho is the Western Group of temples that we’ve just seen,” says Rajrishi. “Temples of the other two groups are less glamorous repeats of the same. So we can make a quick passing visit for these temples. What do you think?”

“Quick visit is ok,” says Godadhar in support of Rajrishi’s proposal. “Moreover, we’ve seen a lot for one day.”

“Umm, ok,” Kamalika consents reluctantly. “The day is also nearing its end. We can always come back after our Jhansi tour.”

“Good, so let’s proceed for the first one,” says Godadhar.

Brahma Temple is a very small Temple with a modest structure comprising a Sanctum and a front plinth that once was a porch.

“Brahma temple is extremely rare in India; is it really a Brahma temple?” asks Kamalika.

“No, not really. It’s called Brahma by mistake, because of the four-faced Linga in the Sanctum.”

“There’s hardly any tourist here.”

“Yes, not popular; let’s go for the next.”

Around 200 m north-east from Brahma Temple is situated **Vamana Temple**. This Temple is dedicated to Vishnu in Vamana (dwarf) Avatar. The Sanctum enshrines a four-armed idol of Vamana. On the Sanctum wall, an image of Buddha is carved while the main niches contain figures of Brahma, Vishnu and Shiva. Design of this Temple is relatively simple. The outer walls are girdled by only two bands of sculptures that include graceful figures of *Surasundaries*. It was built sometime between 1050 and 1075 AD.

Another 200 m south of Vamana Temple is **Javari Temple**. Dedicated to Vishnu, this Temple, simple but elegant, has a well-proportioned architecture standing on a lofty terrace. Its architecture is a marvel as is evidenced by its glamorous *Makara-torana* and a slender, soaring tower. The outer walls have three bands of sculptures with figures as rich as those on the larger temples. On the ceiling of the entrance porch are carved figures of *Navagraha* (nine planets) that are exclusive to this Temple. Along with *Navagraha*, sculptures of Brahma, Vishnu and Shiva have also been depicted. The Sanctum houses a four-armed image of Vishnu.

Ghantai Temple

This Jain Temple is mostly in a state of ruins. But whatever has survived shows what a glamorous temple it once was. It is called Ghantai because of the chain-and-bell (ghanta) motifs carved on the tall pillars that are still standing with their ancient glory and splendid display of sculptural art. A remarkable feature of this Temple is its doorway carvings that depict the sixteen auspicious symbols seen in a dream by the mother of Mahavira (Jain prophet). On the lintel of the doorway is an image of an eight-armed Jain Goddess, *Yakshi Chakreshwari*, riding on Garuda and holding various weapons.

Parshwanath Temple

This Jain Temple, believed to be originally dedicated to the first Thirthankar Adinath, is another spectacular monument of Khajuraho. There is an image of Parshwanath that was installed in 1860 AD. Oblong in shape, it has a gorgeous look distinguished by a front entrance porch with an ornate ceiling and an elegant soaring tower. On the exterior walls there are three bands of lavishly carved figures that bear significant likelihood with those of the Western Group of temples, especially Lakshmana Temple. These figures include notably Parashurama, Balarama with Revati, Rama, Sita, and Hanuman among many more. The lintel of the Mahamandapa doorway is adorned with a ten-armed image of *Chakreshwari* (Jain Goddess) riding on Garuda. This Temple is believed to be built sometime between 950 and 970 AD.

Parshwanath Temple

Adinath Temple

Adinath Temple

Dedicated to Jain Thirthankar Adinath, this small Temple bears close resemblance to Vamana Temple in design and style of sculptures. There are three bands of sculptures surrounding the outer walls depicting Jain *Yakshis*, some Hindu gods and goddesses, and elegant celestial beauties among others.

On the way to the next group of temples, Rajrishi points at another temple, Lord Shantinath Temple. It is a relatively recent one.

The Southern Group of Temples

This group comprises Duladeo, Chaturbhuja and Bijamandala Temples.

“There’s not much new in these temples,” says Rajrishi. “If you still have some energy left we can go for a quick visit.”

“Let’s go,” says Kamalika.

“Incredible, you two are very energetic. So let’s see the last two.”

Duladeo Temple

Dedicated to Shiva, this Temple, the latest in Khajuraho, consists of a Porch, Mahamandapa, Vestibule and a Sanctum. Its main *Shikhara* is clustered by three rows of smaller Shikharas. The architecture of Duladeo is basically of the same type of most other Khajuraho temples. For style of sculptures and contents of iconography too this Temple bears resemblance with other temples with a few variations.

“Local people believe,” Rajrishi says, “the Linga of Duladeo is 1101 Lingas in one and one viewing of it earns the same virtue of viewing every day for three years. People believe lot of things, ha, ha, ha.”

“So now only one more left to go, right?” asks Kamalika.

“Yes, **Chaturbhuja Temple**, it’s located about 3 km from here. It’s very similar to Javari Temple.”

“I think,” Godadhar says, “it’s not worthwhile to take the trouble of visiting it at this time of the day.”

“But haven’t we forgotten about another temple?” reminds Kamalika.

“Yes Madam,” Rajrishi says with a grin, “there’s one, Bijamandala Temple. Hardly anyone goes to see it, it’s still under excavation. We can go if you want.”

“No, let’s call it a day,” declares Godadhar.

At the end of the long day, they finally head back to the hotel.

Aakash (Sky)

Moumita Dutta (Grade 9)

Raj remembered the sky.

He believed that the sky connected everybody in the most beautiful of ways — a never ending dome of azure blues and fiery reds, scattered stars and the silent moon. It comforted him in ways that nothing else could. As a child, Raj wanted to be as close to it as possible.

And strangely enough, the sky had always been there for him.

It was there for him when he folded his first paper airplanes. It was there for him when he saw his first fighter jet, all those years ago. And it was there for him, in the darkest of times, when he watched his best friend, his sister’s husband, falling out of the soft curtain of blue, followed by rusty metal and bullets heavy with the burden of death.

~~

Raj had become friends with Lakshman after his sister — Mira — had introduced the young man to him. They had connected almost instantly, both talking about their careers as pilots and the different airplane models they wanted to try out in the future.

Lakshman was laughing until it hurt and lazing under a hot summer’s sun — there was nothing more that Raj could ask for in a friend. Happiness was permanently hung on Lakshman’s ears, and everybody loved him.

So it was no wonder that, a few months later, his sister announced that she was getting married to him. It wasn’t a big wedding, but it was a joyous occasion. The sky smiled down on the newly wed couple, a few clouds peppering the vast blue space.

It had all felt so perfect.

Why couldn’t it last?

It had been a regular day when he and Lakshman had gone to the post office. The rays of the sun beat down on them, and there were no clouds in sight. But the light, carefree banter between them had died down as they were handed unusual letters.

What was inside was even more alarming.

Being part of the Indian Air Force, Raj had no choice but to follow orders. He knew this. But at the moment, a small part of his brain questioned *why*.

Because the letters informed them that they were to fly with the British against the Nazis. Lakshman looked to him, eyes wide — and scared.

But she's pregnant. *My wife is pregnant.*

Static filled Raj's ears, a sensation that he was sure was ten times worse for Lakshman.

The war had seemed far away until now. It was hundreds upon hundreds of miles away. Suddenly, it all came crashing down on them, and everything felt real. Lakshman's disbelieving face. His sister's tears when they were finally able to tell her the news.

Right before the two young men left for the army, Lakshman and Mira pulled Raj aside. It had been a sad day for them all, and it seemed like there was not much more to talk about after the initial news. But Lakshman and his wife had an inkling of hope left in them.

"You and Lakshman will definitely come back," Mira entreated Raj. "And when you do, you *must* name our child."

It was said so bluntly that Raj had trouble discerning it for a moment. But when it hit him, he realized it was his sister's way of looking ahead into the future — however far, she wanted to look forward to a bright road ahead, with her brother and husband back home.

Thus, Raj agreed. Just like his sister, he would dream of the day that he would be able to name the baby.

A few hours later, the two men left with heavy hearts, saying their last goodbyes.

But Raj couldn't help but think about the possibility that they wouldn't…

No. They would come back.

They would definitely come back.

Those were the words that rang through Raj's head as he embarked on his first mission. Lakshman had been assigned to the same squadron as him. He was the only person that Raj could lean on at that time. Lakshman was the small spot of light in the churning darkness around them; a splash of colour in this new, gray world.

Somehow, their determination to go back home powered them through countless flights and conflicts. But something was wrong on *that day*.

Perhaps it was the tense atmosphere, with so many pilots losing their lives recently. Maybe it was the three enemy jets in the air with them. Or perhaps it was the sky — it was even darker than usual, with a storm brewing a few miles away.

"Raj, if I don't make it…"

The intercom crackled with Lakshman's tired but indignant voice.

"Raj." An urgent note. "I'm sorry."

Before Raj could say anything, he saw Lakshman eject himself from his jet.

A small glimmer of hope.

Then the blinding light, and the deafening sound. It was too late. The explosion was too large, and Lakshman had been caught in the middle.

When Raj lost Lakshman to the gunfire in the sky, his body felt numb — but at the same time, it *hurt*. So, so much. A piece of his soul, his *home*, had been ripped away from him, and there was nothing that he could do.

He couldn't respond to the crackling intercom. When he landed his plane, he couldn't answer the millions of questions directed at him. One month later, when the war ended, Raj was still haunted by the ghost of his own voice — he could not find it in him to speak anymore.

The sky knew the pain Raj bore. It knew of the unbearable, heart-wrenching loss. Anguish. Unable to hear the spoken pain of the one that cherished him so much, it did the one thing that it could do.

The sky silenced Raj. It knew that he would come back when he was ready.

~~~
~~~

In the months following the war, Raj lived his life in silence — a small spot of peace in the ever changing world. But every day, he wished it was different. Sometimes he imagined a different future. Little glimpses of a life that could have been.

The doctors had all told Raj that his voice was lost due to the trauma; there was no known cure, except that it might heal with time.

Raj felt helpless. He could hear his sister's quiet sobbing at night, but he couldn't comfort her with soft words. Lakshman's last words played through his head day after day. And how would he name the child without his voice? Pen and paper were hardly an excuse for Raj. He wanted the child to hear the name from his lips.

Raj sought refuge from the sky, and prayed. Raj had only ever thought of the sky as a vast blue expanse, but perhaps there was a deeper meaning to it as well. If he could find the heavens among the sky, he would be grateful.

Raj prayed day and night for his voice to return. Every day he would grieve, and he felt that every day he and his sister suffered. Lakshman was gone, and he had no voice.

Then one night, Raj had a dream. It was as if the sky itself had come down for him. A lady stood in front of him. Light emitted from her, and she was constantly shifting through all of the different blues of the world. It was too much for Raj to handle, and he bowed down.

You wish for a voice. You will find the strength to start speaking again tomorrow, on the eve of your niece's birth.

When Raj woke up, he remembered the entire exchange clearly. Was it just a dream? Or could it mean something more?

A few hours passed, and Raj waited anxiously for the new child in the hospital.

When he was called in to see the baby, Raj looked at his sister.

*"*What will you name her?*"* She asked, fully expecting for him to use the pen and paper that were handed to him.

He could do it. For himself. For Lakshman.

For the child.

In that moment, Raj didn't feel much different from usual. But something stirred inside him. He couldn't recognize the feeling, but he did recognize the thoughts that came with it.

Raj thought of the sky, of its beauty — and how the sky had helped him through everything. And just like those times, the sky, and the heavens above, would help him now. He wanted this child to have something special to look over him, too.

So Raj opened his mouth, putting his blessings and all of his love into this word:

"Aakash."

And the sky smiled, for the one that had loved it so much was able to speak once again.

Global Warming

Srobona Ghosh (grade 12)

One of the most popular and urgent topics that is being debated all over the world by scientists and environmental experts, is the heating up of the Earth, most commonly known as, global warming. It is a common news-item that we all encounter ever so often, with top leaders of the world arguing on ways to

combat this growing menace. Growing up in India, this has affected me in several important ways. To start with, the intense summer heat and the almost non-existent winter (which is a recent phenomenon) coupled with heavy pollution, had made all of our lives quite miserable. Even though Calcutta was never traditionally considered as one of the hottest cities of the subcontinent, it is very saddening to note that lately it has joined the list. Every summer, Calcutta breaks its own highest record of its previous years. There was not a single day when I didn't hear people complaining about how excruciatingly hot the weather has become lately. Even around thirty years ago, there were very few people to even think about an air conditioner, but now it is almost impossible to live without one. According to the elderly the winters were quite cold, but now it is just like an extension of spring. One could spend all his life without the need to wear a sweater. The scanty rainfall and the fast disappearing monsoons have added to the woes.

So what's behind all this? The first and foremost culprit is the obvious huge rate of deforestation. This has resulted in the failure of agriculture, which is making the poor farmers even poorer by the day and thus the cost of vegetables and fruits has risen considerably. As being a part of a nature-loving family, I went on many trips and hikes to the forests. During those times I would be amazed to see the huge number of tree stumps of felled trees lying around and the dense forests that my parents saw in their childhoods existing no more. When we went on a safari trip to the once famous Palamou forest in Bihar, the forest was in a pitiable condition. There was no animal life whatsoever, and the forest had been reduced to hundreds of tree stumps, as far as eyes could see. When my parents went to the same place as kids, they were able to experience a wide variety of flora and fauna. All the stories I had heard from them had no connection with the trips I went to. It seems as if they lived in a very different world than I am in today. I could easily make the connection between the severe heat and deforestation.

After coming to Canada, I witness people, talking about the disturbed weather patterns a lot. Before, the weather was more predictable, while now it has become more random and haphazard. To add to this, there are a lot of discussions about the increased intensity and frequency of tropical hurricanes in the States, which are commonly heard on the news. Also, one of the alarming factors in Canada is the melting of the polar ice caps, endangering the survival of the majestic polar bears. All these are linked to global warming.

It is to be noted that one of the main causes of the heating is the greenhouse effect. The main greenhouse gas is carbon dioxide, which is a by product of a lot of reactions taking place in thousands of factories all around the world. These huge masses of carbon dioxide are accumulating in the Earth's atmosphere, trapping the sun's heat and making our planet hotter with time. Even car exhausts contribute a lot to the present amount of greenhouse gases. This is an even bigger problem in developing countries such as India, where many people are poor and thus they use bad quality gas for their vehicles, as a result, severely polluting the air. In addition to that many of the people in India are not educated, and thus don't understand what global warming is, or how it affects us. They are only concerned with how much money they are able to save. This tells us that if global warming has to be reversed, first we have to educate the illiterate and demolish poverty. If we can't do that, global warming will persist and will get worse by the day. Having

experienced the causes and effects of global warming first hand in India this has affected me on a personal level.

As our great poet Rabindranath Tagore had once said, the most important things in life have been given to us for free.

পৃথিবীতে সকলের চেয়ে বড়ো জিনিস আমরা যাহা কিছু পাই তাহা বিনামূল্যেই পাইয়া থাকি , তাহার জন্য দরদস্তুরকরিতেহয় না। মূল্য চুকাইতে হয় না বলিয়াই জিনিসটা যে কত বড়ো তাহা আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতেই পারি না।

The cool shade of the endless forests, the fresh air, the welcoming rain on the parched dry land quenching the thirst for one and all have been provided by Mother Nature without a price tag attached to it. It is therefore our duty to respect and take care of our home, the Earth.

সব দেশে মোর ঘর আছে

(MIGRATION STREAMS OF INDIANS ABROAD: A BRIEF REVIEW)

Arun Roy

Rabindranath, acknowledging the extensive presence of Indians abroad, wrote in his poem প্রবাসী : সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া ।দেশে দেশে মোর দেশ আছে, আমি সেই দেশ লব যুঝিয়া ।।

India has one of the world's most diverse and fascinating migration histories. Since the 19th century, Indians have established communities on every continent as well as on islands in the Caribbean and the Pacific. According to a recent survey conducted by Economic and Social Council of UN, India has the largest diaspora population in the world, estimated at 32 million. Indian Diaspora or Persons of Indian Origin (PIO) are defined as those or whose any of the ancestors (parents, grandparents, great grandparents or any other ancestors) were born in India and settled in a foreign country. In terms of absolute numbers, the largest number of Persons of Indian Origin is in the USA.[1] Six countries in which largest numbers of PIOs are found are: USA (4.5 million), followed by Saudi Arabia (4 million), UAE (2.8million), Malaysia (2.4 million), UK (1.8 million), and Canada (1.5 million). Two other countries, South Africa and Myanmar also report 1.2 million Persons of Indian Origin. There is also a notable presence of PIOs in Mauritius, Singapore,

[1] For details, see UN Economic and Social Council and Ministry of External Affairs, Republic of India, Non-Resident Indians and Persons of Indian Origin. Statistics were compiled from a variety of diverse sources including the Censuses of foreign countries.

Sri Lanka and Australia. In Ottawa, according to a special tabulation by Statistics Canada, there are a little over 30,000 “Indo-Canadians”.
In some countries, although the number of PIOs is small, relative to the national population it is large. For instance, in Mauritius and Guyana, PIOs relative to the national population are 62% and 60% respectively. For some other countries, the figures are: Fiji (37%), Trinidad and Tobago (35%), Qatar (30%), UAE (27%), Canada (3.5%), UK (2.3%), and USA (1%).

Emigration of Indians: Three Phases

The composition of flows of Indians has evolved over time and also in terms of the source and destination; starting from mainly indentured labor in far-flung colonies to postwar labor for British industry to high-skilled professionals in North America and low-skilled workers in the Middle East. In addition, ethnic Indians in countries like Kenya and other African countries have migrated to other countries especially UK, USA and Canada, a movement which can be described as “secondary migration”.
Emigration of Indians can be divided into three phases: (i) Ancient India, (ii) British colonial period and (iii) Postwar period.

(i) Ancient India.

According to historians, the first wave of Indian migration occurred towards Southeast Asia during the reign of Ashoka (3rd century B.C.) and continued until the time of Samudragupta (4th century A.D.).
Details are somewhat speculative and sketchy. However, there is some evidence that large numbers of Indian missionaries, mainly Buddhists and merchants visited several countries in South-east Asia (Thailand, Cambodia, Indonesian islands of Sumatra, Java and Bali, and Sri Lanka), and over time settled down in those countries. They gradually became integrated into the local population. But the Indian influence is still visible in temples and names of places and street names. For instance, in Thailand (Bangkok) there is a township named Ayuthya (named after the kingdom of Ayodhya in ancient India) of which there are visible and discernable ruins. Again, in Thailand, there are ruins of a kingdom called Sukhothai (meaning abode of happiness in Sanskrit). Similar traces of Indian language and culture can be found in the islands of Sumatra, Java, Bali, and also in Cambodia, and Sri Lanka**).**
Some anthropological studies demonstrate that many of those with origins in India are aware of their Indian ancestry in the distant past but are largely integrated into the language and culture of the countries in which they are now settled for many centuries. For more details, see A.L. Basham, *A Cultural History of India*.

(ii) <u>British colonial period</u>

Following the abolition of slavery in 1833, the colonies urgently needed manpower, particularly on sugar and rubber plantations. To meet this demand, the British established an organized system of temporary labor migration from the Indian subcontinent. This came to be officially known as “indentured labour”. The British sent out agents or contractors to rural areas to enlist workers who were willing to work in the British colonies. On account of poverty and unemployment in the rural areas, a large number of them accepted to become indentured labour force. Generally, the contract was for 5 years. The contract offered a passage to the destination country. No family member was allowed. At the end of the contract, an option was given a free passage back or receive a grant of land for farming and settle down. Records show that many indentured workers opted to stay in the foreign lands and settled down in farming and other professions. Over decades and over several generations, descendants of these workers gradually moved to semi-skilled and skilled professions. Many of these workers moved into business and became business magnates in Hong Kong, Singapore and several African countries especially Uganda, Kenya, South Africa (e.g., Madhvani and Mehta groups of industries).
Indentured laborers from India worked as manual and unskilled workers in the railways, mining, tea, coffee and rubber plantations. Workers in South Africa, Uganda, and Kenya worked mainly in the railways, in Burma and Ceylon they worked in tea and coffee plantations. In Burma and Malaysia they worked in rubber

plantations. In South Africa, in addition to railways, large numbers were employed in mining, especially diamond mines.

Indentured workers were drawn from some specific regions of India. For instance, to Malaysia, indentured workers were drawn from Bihar and UP, to African countries - South Africa, Kenya and Uganda - they were drawn from Gujarat and Punjab. To Thailand, Mauritius and Fiji Island - they were drawn from South India (Tamils), to Burma from Bengal and Assam, to Singapore and Hongkong from Punjab and UP. It is not very clear why they were drawn from some specific regions of India for some of these the specific destinations. During the British colonial period, the British government followed a liberal immigration policy towards its colonies and a large number of Indians in highly educated categories moved to UK.

(iii) Postwar Period

Migration to Germany

After the Second World War, there was a large scale emigration of Indians into Germany. This was prompted by a huge labor shortage due to heavy casualties of manpower in the war; Germany lost about 6 million military and 2 million civilian population. To replace its labour force, Germany encouraged young people to go to Germany on work permits---in most cases it did not grant immigration or citizenship. In course of time over the next few decades, a large number of these Indians gradually moved to other Western countries. This can be described as “secondary immigration”.

After Indian Independence

After India’s independence in 1947, there was a large-scale emigration of Indians from India to USA, Canada, and later to Australia. Several of these countries relaxed their immigration policy to encourage immigration in the professional categories - scientists, doctors, engineers, among others. This was especially notable in Canada and USA. The decade of 1970s witnessed immigration of many Indians from India into Canada and US. After some years, a similar flow occurred in Australia when it revised its “white only” immigration policy.

In many African colonies, members of the Punjabi and Gujrati communities many of whom originally came as indentured labourers over generations became well established and wealthy. During the 1980s, with the growing independence of the British colonies and accusation and provocation by politicians that these foreigners were wielding too much economic power and controlling the economy, there was a noticeable trend toward Africanization often resulting in racial tension (most notably in Uganda). This resulted in many of these Indian migrants emigrating to UK and North America (secondary immigration).

Migration to the Middle East

With oil boom in the Middle East during the 1970s, there had been a steady stream of migration from India. For instance, annual migration of Indians to the UAE, which stood at 4,600 in 1975, rose to over 125,000 by 1985, and stood at nearly 200,000 in 1999. In UAE, more than 27% of the population are from India. There is a close resemblance of this migration stream to the Middle Eastern countries to that to Germany during the 1950s and 1960s. As in Germany, a vast majority of Indian migrants are on employment-based or trade visas. The skill levels of these migrants have been of two types - the majority of them in low-skill categories and others in high-skill professional category.

In addition, many Indian entrepreneurs in the UAE have established successful national conglomerates and have become multi-millionaires. Some notable of these industrial conglomerates are Landmark Group, Jashanmal, Ajmal Perfumes, Jumbo Electronics, and Choithram's. Remittances to India from the Non-Resident Indians in these Middle Eastern countries presently account for a significant source of foreign exchange for India. There has been a noticeable trend among these temporary Indian migrants in the Middle East in the professional categories toward seeking immigration and settling down in USA, Canada, and Australia.

----- XX -----

Road Trip to beautiful destinations

Sayesha & Sanjana Roy Choudhury (Grades 7 & 4)

This summer, our grandparents came to visit us. We thought what a better way to spend time with family than to go on a road trip! We planned to visit the Maritime Provinces because it was somewhere we've never been to. We wanted to go on an adventure somewhere far from home. So one day my parents sat on the computer started booking tickets, hotels and Airbnb's. After weeks of planning it was finally time to start the adventure.

On July 28 2018, we woke up bright and early at 6:00 in the morning. Our first destination was Montmorency falls in Quebec City. We stared at our GPS to find out how many kilometers we were driving, and saw that it was 450 kilometers. It wasn't that bad for us because we had done much more before. Our dad started the car engine and we started this road trip!

We were in the car, my dad was driving, and my mom was navigating. After a couple of stops to pick up some snacks and stretch our arms and legs, we saw a big sign that read: Montmorency falls in 2 km. We all were so excited!! We walked to the viewpoint of the falls and took many pictures, the falls was breathtaking! We decided to do walk down the staircase, which has 487 steps and is 276 feet high. The stairs led right in front of the waterfall, and we got drenched! We took the cable car up to the top of the falls and met our grandparents at the bridge. After lunch, we said goodbye to Montmorency falls and kept driving.

Montmorency falls to our hotel was 370 km. We arrived at our hotel at 7:00. We checked in to our hotel and headed to our room. After dinner, we went swimming in their indoor swimming pool. My parents were in the Jacuzzi and my sister and I spent an hour in the pool swimming, what a great way to end of our day!

The next day, we drove to Moncton. On the way, we stopped at Fredericton for lunch. After a delicious lunch of eggs benedict, lobster rolls, and steak, we drove on to Moncton where we had rented an Airbnb. Once we rested and had coffee. To end the day, we went to Magnetic Hill. Magnetic hill pulls your car up a hill without having to press the accelerator. It is an optical illusion, but we still haven't figured out how it works! So cool!

The next day, we went to PEI. We stopped at a lobster restaurant called Fisherman's Wharf for lunch. After a gigantic lobster lunch, we went to Anne of Green Gables house. We explored the house and the surrounding enchanted woods, and also got some souvenirs from the shop. After this it was beach time! We went to Cavendish beach, my sister and I swam in the Atlantic water and my parents were watching us, while they were on the sand. The sand was a beautiful red, and the coral colour one we hadn't seen before. We stayed at the beach for about 3 hours, and then returned to our Airbnb in Moncton.

The next morning, we visited Hopewell Rocks. There were tall red rocks standing on the sandy ground. We went at low tide because we wanted to see the rocks and walk on the ocean floor. The water was red, due to the famous red sand of New Brunswick. We then drove to Blacks Harbor to take a ferry to Grand Manan Island. The ferry ride was 90 minutes long. From the deck of the ship, we suddenly saw a group of porpoises! There were five porpoises traveling in the water, and we also saw whales and seals!

After a delightful trip on the ferry, we went to our hotel on Grand Manan Island. We learned our hotel, The Marathon Inn, was the oldest living hotel in Canada. We ate pizza for dinner and then we drove to a lighthouse. My dad, sister and mom walked to the lighthouse. I stayed back with my grandparents watching them. After some time they came back and they said they saw more seals. What a cool island! They came back from the lighthouse and we ended of our day by watching a sunset from beginning to end. It was so beautiful.

We woke up bright and early the next morning and took a ferry back to Blacks harbor and then drove to Quebec City, a distance of 690 kilometers. We checked into our Airbnb for the night. The next morning, we drove to Le Petit Champlain. The streets were so beautiful, and there were tiny little stores all around so we decided to go shopping! There were so many people there, and many people dressed up to show us how people lived in the olden days. After lots of sightseeing, having lunch and stopping at souvenir stores we went back down to look at a few more

stores and go back home. Old Quebec was definitely one of the prettiest streets I have ever seen.

After this we drove back home which was another 450 kilometers back home. We arrived at home at about 9:00pm, exhausted from all the traveling. We were so glad that we could travel to all these places by road and I definitely want to do this again. All the planning really paid off and this was a memory we won't forget anytime soon!

----- XX -----

The Garden

Swarnava Ghosh, Grade 9

No sooner than I moved to Cleveland, I started to develop an aversion to this place. Well, to speak the truth, as my airplane descended towards Cleveland and I got a glimpse of the city from above my heart began to sink at the sight of an endless sea of houses and buildings with hardly any trace of greenery. And thereafter, it did not take long for the initial excitement of coming to a new life in a great country to fade away and instead give way to an acute loneliness.

I am from Nepal, where the mighty Himalayas rise high to make its snow capped peaks meet the sky and where the clouds float and play amongst the dense forests of tall pines and oak. I grew up as a tiny being within the vast nature and always took for granted the surrounding hills, valleys and forests as being a part of my existence. And I had very little idea of how living in a huge modern city was. But the promise of a better life with many luxuries, as compared to my simple life, implored me to take up this opportunity as an accounting officer in Cleveland. The job offer had fired up my imagination and had seemed like an opportunity to explore and see the big world outside the boundaries of my small little town. But once I arrived here I started to miss my homeland which I did not anticipate coming.

So now whenever I close my eyes and think, I get transported to that heavenly place, far from the maddening crowd. But as I open my eyes again, my mind jumps back to the reality which does not include any of the above but only a forest of bricks.

It had been just over six months that I arrived at Cleveland, and somewhat trying to settle down in a tiny rented apartment whose windows looked upon those of other apartments. At first, it was very difficult for me to navigate around the streets, but now I was getting used to it. My workplace was not that far from where I lived, so I covered that distance with a second hand bike that I bought about three months ago from a garage sale.

One day, as I was returning from my work, I thought that instead of following my usual route, I could use another one just to get to know the area a bit better. So I carefully plotted a new path with the help of a map. Then I started off.

It was about two minutes into the ride on the new street when I spotted something, a thing which looked unusually familiar to me but wasn't expecting in such a place. It was a beautiful garden, green as ever in the midst of the city. But that's not all. There were many kinds of plants growing in it. Bright red tomatoes, lettuce, eggplants, squash and all kinds of fruit and vegetable plants scattered across the garden. I parked my bike and stepped onto the soil. I went into a little farther and sat on a rock. Then, I closed my eyes and imagined that I was sitting right in the heart of the Himalayas, breathing in that fresh scent of the pines, hearing the faraway calls of a barking deer from the forest down the valley warning of a moving tiger and looking at the mighty range stretching from East to West for miles on end.

I passed almost fifteen minutes lost into my reverie and when I opened my eyes, I saw a man staring at me with round, curious eyes. He was in a jogging suit and seemed to be from India and had a huge watering can in his hand. He stepped forwards as I stood up. Just as I was about to open my mouth, He spoke out, extending his hand,

"Hi, I'm Amir. Nice to meet you!"
"Hello, I'm Rohit, nice to meet you too", Said I, shaking his hand.
"I've never seen you around here, do you live nearby?" He spoke again.
"Yeah, I just live a few blocks away. I actually moved here a couple of months ago from Nepal."

"Oh! The Himalayas!" he looked very excited. Then I told him all about myself and how I accidentally encountered the garden and sat here taking my mind half-way across the world. As I spoke, he went over to the eggplants and started watering them. He also told me about himself, about how he was from India (as I predicted) and that he was a manager at a fabric store. He also told me the entire story of how he stumbled across the garden and how he and others had chased away a criminal down from here. I was surprised! Soon several others joined him. Each became busy tending to their own little plots within the garden.

The people at the garden were as varied as the garden itself and all were friendly and welcomed me. I also met a young girl, Jasmine, from the Philippines who explained in details how they started this garden from a wasteland, how they slowly and painstakingly converted this into such a beautiful green space with a great combined effort.

At this point, I should tell you that I never was a very gregarious person. I never had many friends in my life and I am usually content to live on my own. I was always one of the shy students in school who mostly kept to himself. So, I never understood the value of friendship. But now, it seems for the first time, I did. Next day after work, I went to the market and bought some sunflower seeds. I felt a new purpose in my life and a new happiness came over me.

Fast forward six months from then. The slanting rays of the evening sun created a feeling of warmth all around. The sunflowers I had planted had grown tall and seemed to beam with delight. That day, we were having a barbeque party at the garden. Many people had come who all belonged to different parts of the world, but all of us had a common bond - The Garden. We spoke to each other exchanging our life stories, interesting anecdotes from our past. Jasmine had an idea. She wanted to find out other such wastelands around the city and turn them into beautiful gardens. "We can write to the municipality, we can make them see our dreams so that they will provide the necessary machineries to clean the land!!! Come on, let us all get working on this from today!!!" she spoke with excitement. Her enthusiasm carried onto me as well and we began to discuss the possibilities.

Soon the music started. Some sang on their guitars while others played their banjo. I on the other hand, had brought my flute along with me and played one of my favorite tunes. How enjoyable that evening was! Cleveland had become my second home!

The Transformation: Narendra to Swami Vivekananda

Moitree Dutta (Grade 6)

Narendra Dutta was born
A prayer answered.
This boy and his family had no knowledge
Of how the world would be forever altered.

Pre-School, he was a naughty boy,
He knew how to get on everybody's nerves.
His mother could only calm him down whilst speaking the name of Shiva.
She used it often, ice water completing the verve.

Starting school, all professors were amazed,
Such was the greatness of Naren's memory!
Even when disrupting class,
He learned, so great was his sensory!

He quickly became a leader,
Both at studies and among friends.
Recognized a powerful orator,
He brought many issues to an end.

Young Naren was often confused about castes,
'What is the use? Why must it not be broken?' he asked.
With rightful curiosity,
He himself declared it without task.

No matter caste nor colour,
If anyone came knocking.
Naren would always run to the door,
Anxious to give something.

It did not matter whether it was
Saris, food, or a new dhoti,
Naren had to give something,
Even if it was half-baked roti.

As he grew he loved to play games,
He found sport even in meditation!
Once even, he did not notice a snake that spooked his friends,
For he had had been immersed in elation!

But to a student like him, the biggest question was "Have you seen God?"
For he could not believe in something with no proof.
Around every corner he went, to all sannyasin he asked this fearlessly,

But alas, there was no ‘Yes’ under the sun’s golden roof.

Then, finally, someone said ‘Yes’,
As clearly as if someone asked if a ball was round.
This person was Sri Ramakrishna,
Narendra was surprised and fascinated, that fact was sound.

Over time they became teacher and student,
Sri Ramakrishna teaching Narendra many different knowledge streams.
Over time Narendra became interested in renunciation,
Something his parents did not want him to even dream.

At the time when he took his university exams,
His parents planned for marriage.
By then Naren’s spirituality had blossomed
So he gave up worldly pairage.

After that, Naren lost his father in 1884.
Relatives squabbled over property rights, cutting their ties evermore.
The family fell into the clutches of poverty,
Narendra often going without so that his family might eat properly.

He took on as many jobs as possible,
Lawyer, teacher, but it was not enough.
He did not know what to do,
Was disheartened, as the situation was tough.

One day he went to his guru and said
“You must help! Please speak to the Mother for me!”
Yet Sri Ramakrishna insisted,
‘It would be better for the matter if you go yourself and see.’

In that vein Narendra went to pray three times,
But his problem wasn’t resolved.
He could not ask for worldly things,
His former prayers dissolved.

And what did he ask for?
He asked for *vivek,*
Wisdom at it’s finest,
There was no looking back.
He began to see God as the Divine Mother,
And found worldly matters seldom bother.

This was the beginning of Swami Vivekananda,
A man of spirit who shook the world.
He traveled far and wide,
The messages of Vedanta unfurled.

Swami Vivekananda is an example
Of intelligence, strength and divinity in the same word.
‘Seeing everybody as if they were God’,
That message was clearly heard.

আমার পূজা

ঝর্ণা চট্টোপাধ্যায়

স্বচ্ছ মনের প্রীতি, দয়া, ক্ষমা, ভালবাসা
দেখি সেথায় ভগবানের আসন আছে পাতা।
আমার শ্রদ্ধা করি নিবেদন।
অসহায়ের তরে যখন হাত বাড়ানো দেখি
বন্ধু ভেবে সবার তরে মনের সমব্যথা-
দেখি সেথায় ভগবানের আসন আছে পাতা।
প্রণাম আমার করি নিবেদন।
পরের বিচার নেই কো যেথায়, ঈর্ষা-অহংকার,
দৃষ্টি যেথায় ভালোই শুধু দেখে ,
দেখি সেথায় ভগবানের আসন আছে পাতা।
অঞ্জলি মোর করি নিবেদন।
শক্তি যেথায় ছড়িয়ে আছে মঙ্গলময় রূপে
হৃদয় যেথায় ঐশ্বর্যে ভরা
দেখি সেথায় ভগবানের আসন আছে পাতা।

My worship

Jharna Chatterjee

I see unconditional love, transparency
Forgiveness, kindness, patience
I know God’s presence is there,
I bow to God, I worship.
I see someone with true compassion
Reaching out to the helpless, the lonely,
I know God’s presence is there,
I bow to God, I worship.
If someone judges self, not others
No jealous egoism, harsh words,
I know God’s presence is there,
I bow to God, I worship.
Strength stretches its auspicious arms
Mind is filled with endless wealth
I know God’s presence is there,
I bow to God, I worship.

The Charity Stream

Reeto Ghosh, Grade 9

The Charity Stream began as a class marketing project. The project was made to make the world a better place. However, unlike most school projects, this one had one miniature twist- instead of simply proposing the plan to our class in a presentation, we were all expected to put the project to real life effect and actually help change the world. Immediately our skilled group of eight had the idea of hosting a video game tournament in our school auditorium. Our group - not knowing what came before us chose the hardest option out there - to raise one thousand dollars for charity.

Our group chose to fundraise for the Canadian Mental Health Association (CMHA). We chose the CMHA because we found that the discussion about mental illnesses is important in today's time. While fundraising, our team planned to raise awareness and wished to teach people that speaking about your mental health is not something that should be hushed, and though to some, our event seemed like just an NBA 2k gaming tournament - to us, it was a chance to make the world a better place.

My group members and I were really ambitious, and one of our first moves was to try and get sponsors for our event. So we called up various treat shops to get treats for our canteen. They declined our offer at first, in a nice way. We visited treat shops and talked to them face to face, they still rejected. But our ambition did come with a prize. A sponsorship from Puma. So, how did we manage to get a tiny sponsorship from one of the biggest sports companies in the world? A company that sponsors Usain Bolt? We used our assets. In a group of eight, it's understandable that many of us have talents. One of our group members is one of the top 14-year-old runners in Canada and his runner's club has a sponsorship with Puma. He spoke with his trainers and they were very excited to sponsor us! Of course, it was a small sponsorship of $150 but it was still very helpful. We used this $150 as a prize for winning the tournament! As such, each of the two winners would win $75.

Alright, we had a prize for sure but we needed a good plan. How do we raise $1000 from a gaming tournament? Well here was our plan. We would sell event tickets for a two-week stretch and also try to get donations. At the end of this two-week stretch, we would take the numbers and make a tournament planner. Towards the end of the week, we got some good news! The teacher of our schools' high school culinary section agreed to lend us his kitchen, ingredients, and guidance as he believed that we had a very noble cause. Quickly on the last two days of our two weeks, we had to make cookies, brownies, chocolate banana bread, and cupcakes. We tried our hardest to finish this before the event. Finally, on the final day, we took all our recess and lunchtime to finish packing all of our food.

Running a charity event required lots of planning and time put into it. Many nights working until midnight just so we could manage to get our plan approved by our teacher the next day. We spent hours and hours signing permission forms, event forms, getting sponsors, making tickets, selling tickets, making cookies, brownies, banana bread, and cupcakes. Then the big day came, the day of the event we put so much time into and it was a success. At the end of the day, we raised $569.35 for the CMHA. We got about $250 in donations, $200 for food from our canteen and the rest from our event and other donations. Through our efforts, with this event, we learned the overall goodness of

some people, how and when you ask some of our fellow students for donations they'll run to their locker to get a dollar or give up some of their lunch money. This was really like, "charity begins at home", here at our school and the true value of money raised far exceed the thousand dollar mark. We at our school and the neighbourhood community definitely understand the mental health issues better than before. (https://thecharitystream.wixsite.com/home)

----- XX -----

হেসে নাও দুদিন বই তো নয়...

(নানা উৎস থেকে সংগৃহীত)

A Student who got 0 in his test was surprised because all his answers were seemingly correct! Read his answers and see if you agree.

Q.1 - In which battle did Tipu Sultan Die?
Ans. - In his Last Battle.

Q.2 - Where was the Declaration of Independence Signed?
Ans. - At the Bottom of the Page.

Q.3 - What is the Main Reason for Divorce?
Ans. - Marriage.

Q.4 - Ganga Flows in which State?
Ans. - Liquid State.

Q.5 - When was Mahatma Gandhi Born?
Ans.- On His Birthday.

Q.6 - How will you Distribute 8 Mangoes among 6 People?
Ans - By Preparing Mango Shake.

শাস্ত্রের বিধান

ধর্ম্মপিতা - নিজের পিতা নন।
ধর্ম্মমা - নিজের মা নন।
ধর্ম্মপুত্র - নিজের পুত্র নয়।

ধর্ম্মভাই - নিজের ভাই নয়।
ধর্ম্মবোন - নিজের বোন নয়।
কিন্তু, বন্ধুগণ, এই ভুলটা কি করে হয়ে গেল? ধর্ম্মপত্নী মানে নিজের বৌ!??
খুঁজে দেখুন, শাস্ত্রে নিশ্চয়ই ভুল হয়ে গেছে।

উত্তরাধিকার

এক বৃদ্ধ হাসপাতালে তাঁর শেষ নিশ্বাস ফেলছিলেন। বেডের পাশে তাঁর স্ত্রী , দুই ছেলে, এক মেয়ে আর একজন নার্স দাঁড়িয়ে ছিল।
বৃদ্ধ বড় ছেলেকে বললেন "বাবা, আমি তো আর বেশীক্ষন বাঁচবো না। তাই পার্ক স্ট্রিটের ১৫ টি বাড়ি তুই নে।" মেয়েকে বললেন "ধর্মতলায় ১৭ টি বাড়ি তুই নে।" ছোটো ছেলেকে বললেন - "তোকে তো আমি খুব ভালোবাসি তাই বেহালার ২০ টি বাড়ি তোর।" স্ত্রীকে বললেন "আমার যাবার পর কারো কাছে তোমাকে হাত পাততে হবে না। তাই ডিএলএফের ১০ টি ফ্ল্যাট তুমি রাখো।"
তখন নার্স তাঁর স্ত্রীকে বলল " আপনি কত ভাগ্যবান, আপনার স্বামী আপনাদের জন্য কত সম্পত্তি দিয়ে যাচ্ছেন।"
স্ত্রীঃ "কিসের সম্পত্তি !! ও দুধয়ালা!! বাড়ি বাড়ি দুধ দেয়। আমাদের সকালে দুধ দেওয়ার Duty ভাগ করল"।

প্রেমিক-প্রেমিকার কথোপকথন

প্রেমিকা - বাবা আমাদের বিয়ের জন্যে একটা শর্ত দিয়েছেন।
প্রেমিক - কি শর্ত বলো। আমি সব শর্ত মেনে নেবো।
প্রেমিকা - তোমাকে বীরভূম এ nomination দিয়ে জিতে দেখাতে হবে।
প্রেমিক - আসি রে বোন। ভালো থাকিস।

KILLER ENGLISH by TEACHERS

PT Teacher: You three of you, stand together separately.
Geography Teacher: Will you hang that map or else I'll hang myself.
Principal: Tomorrow call your parents, especially Mother and Father.

And the terrific one:
English Teacher: Why are you looking at the monkeys outside when I'm in the class!

Iceland Splendour

Jharna Chatterjee

Ice lagoon

Goda Foss (Falls)

Gull foss (Falls)

The Bird

Arna Nandi, Grade 2